ভারতে বিবাহের ইতিহাস

ডঃ অতুল সুর

শঙ্খ প্রকাশন

সূচী

পৃষ্ঠা

। এক ॥

যৌন জীবনের পটভূমিকা

প্রাণী জগতে মানুষই বোধ হয় একমাত্র জীব যার যৌন ক্ষুধা সীমিত নয়। অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রেই সন্তান উৎপাদনের জন্য যৌন মিলনের একটা বিশেষ ঋতু আছে। মাত্র সেই নির্দিষ্ট ঋতুতেই তাদের মধ্যে যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং স্ত্রী-পুরুষ একত্রে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। একমাত্র মানুষেরই ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট ঋতু নেই। মানুষের মধ্যে যৌন মিলনের বাসনা সকল ঋতুতেই জাগ্রত থাকে। এই কারণে মানুষের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষকে পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকতে দেখা যায়। বস্তুত, মানুষের মধ্যে পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকা, স্ত্রী-পুরুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই মানুষের মধ্যে পরিবারের উদ্ভব হয়েছে। পরিবার গঠন করে স্ত্রী-পুরুষের একত্র থাকার অবশ্য আরও কারণ আছে। সেটা হচ্ছে বায়োলজিকাল বা জীবজনিত কারণ। শিশুকে লালন-পালন করে স্বাবলম্বী করে তুলতে অন্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের অনেক বেশী সময় লাগে। এ সময় প্রতিপালন ও প্রতিরক্ষণের জন্য নারীকে পুরুষের আশ্রয়ে থাকতে হয়। মনে করুন অন্য প্রাণীর মত, যৌন মিলনের অব্যবহিত পরেই স্ত্রী-পুরুষ যদি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতো, তা হলে মা ও সন্তানকে কী না বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হতো। বস্তুত, আদিম যুগে নারীকে সব সময়ই পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হতো। যুগে যুগে যদিও নারী নির্যাতিত হয়েছে পুরুষের হাতে, তথাপি সে তার প্রেম, ভালবাসা ও সোহাগ দ্বারা পুরুষকে প্রলোভিত করেছে তার অতি নিকট সান্নিধ্যে থাকতে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মনুষ্য-সমাজে পরিবারের উদ্ভব হয়েছে জীবজনিত কারণে। বিবাহ দ্বারা পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অনেক পরে এবং এক বিশেষ প্রয়োজনে। আদিম মানুষের পক্ষে খাদ্য আহরণ করা ছিল, এক অতি দুরূহ ব্যাপার। পশু মাংসই ছিল তার প্রধান খাদ্য। পশু শিকারের জন্য আদিম মানুষকে প্রায়ই নিজের আশ্রয় ছেড়ে অনেক দূরে যেতে হতো। অনেক সময় তাকে একাধিক দিনও দূরে থাকতে হতো। এভাবে পুরুষ যখন দূরে থাকতো, তখন তার নারী থাকতো সম্পূর্ণ অসহায় ও রক্ষকহীন অবস্থায়। অপর কোন পুরুষ তাকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে গেলে, যুদ্ধ ও রক্তপাতের সৃষ্টি হতো। এরূপ রক্তপাত পরিহার করবার জন্যই, মনুষ্য সমাজে বিবাহ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ওয়েস্টারমার্ক বলেন—"পবিবার গঠন করে স্ত্রী-পুরুষের একত্র বাস করা থেকেই বিবাহ প্রথার উদ্ভব হয়েছে, বিবাহ প্রথা থেকে পরিবারের সূচনা হয় নি।" মহাভারতে বিবৃত শ্বেতকেতু উপাখ্যান থেকেও আমরা এর সমর্থন পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে শ্বেতকেতুই ভারতবর্ষে প্রথম বিবাহ প্রথার প্রবর্তন করেন। কিন্তু বিবৃত কাহিনী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তার আগেই শ্বেতকেতু তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে পরিবার মধ্যে বাস করতেন।

যদিও পণ্ডিত মহলে আজ একথা একবাক্যে স্বীকৃত হয়েছে যে পরিবার থেকেই বিবাহ প্রথার উদ্ভব হয়েছে, তথাপি বাখোফেন, মরগান প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদগণ একসময় একথা স্বীকার করতেন না। তাঁরা এই মতবাদ প্রচার করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন যে, বিবাহ প্রথা উদ্ভব হবার আগে মানুষের মধ্যে কোনরূপ স্থায়ী যৌনসম্পর্ক ছিল না। তাঁরা বলতেন যে অন্যান্য পশুর মত মানুষও অবাধ যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হতো। তাঁদের মতে আদিম অবস্থায় মানুষের মধ্যে যৌনাচার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন অনুশাসন ছিল না। তাঁরা বলতেন যে অনু-

শাসনের উদ্ভব হয়েছিল অতি মন্থর গতিতে, ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে। তাঁদের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে নানারকম বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে তাঁরা এক বিবর্তনের ঠাটে সাজিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে মানুষের বর্তমান একপত্নীক বিবাহ প্রথা এই সকল ক্রমিক স্তরের ভেতর দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে।

সন্তানকে লালন-পালন ও স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য মানুষের যে দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হয়, একমাত্র এই জীবজনিত কারণই একথা প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক যে মনুষ্য সমাজে গোড়া থেকেই স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে থাকতো। বস্তুত আদিম অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ যে অবাধ যৌনাচারে রত ছিল, এই মতবাদ পূর্বোক্ত নৃতত্ত্ববিদগণের এক নিছক কল্পনামূলক অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ অবাধ যৌনমিলন মনুষ্যসমাজে কোনদিনই প্রচলিত ছিল না। এমন কি বর্তমান সময়েও অত্যন্ত আদিম অবস্থায় অবস্থিত বনবাসী জাতিসমূহের মধ্যেও অবাধ যৌনমিলনের কোন রীতি নেই। বস্তুত এই সকল বনবাসী অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে যে সকল বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, তা অতি কঠোর অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির মধ্যে পর্যবেক্ষণ করলেও আমরা এর সমর্থন পাই। বনমানুষ, গরিলা প্রভৃতি যে সকল নরাকার জীব আছে, তারাও দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস করে, কখনও অবাধ রমনে প্রবৃত্ত হয় না। এই সকল কারণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহ আখ্যা দিয়ে তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকুক আর না থাকুক, স্ত্রী-পুরুষের একত্রে মিলিত হয়ে পরিবার গঠন করে সহবাস করবার রীতি মনুষ্য সমাজে গোড়া থেকেই ছিল।

আদিম-মানবের পরিবার ছিল অনেকটা পাশ্চাত্য দেশসমূহে আজকাল যে রকম পরিবার দেখতে পাওয়া যায়, তারই মত। পিতা-মাতা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নিয়েই এই পরিবার গঠিত হতো। কিন্তু আমাদের দেশের পরিবার ছিল স্বতন্ত্র রকমের। এ পরিবার ছিল

অধিকতর বিস্তৃত। এ ছাড়া পাশ্চাত্য দেশের পরিবারের সঙ্গে ভারতের পরিবারের এক মূলগত পার্থক্য ছিল। ভারতের পরিবার ছিল অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র যমরাজা বিচ্ছেদ না ঘটালে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কখনও বিচ্ছিন্ন হতো না। তার কারণ পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। ভারতের পরিবার ছিল স্থায়ী পরিবার। এর পরিধি ছিল অতি বিস্তৃত। এজন্য একে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার বলা হতো। এই পরিবারের মধ্যে বাস করতো স্বয়ং ও তার স্ত্রী, স্বয়ং-এর বাবা-মা, খুড়ো-খুড়ি, জেঠা-জেঠাই, তাদের সকলের ছেলে-মেয়েরা, স্বয়ং-এর ভাইয়েরা ও তাদের স্ত্রীরা ও ছেলেমেয়েরা এবং নিজের ছেলেমেয়েরা। অনেক সময় এই পরিবারভুক্ত হয়ে আরও থাকতো কোন বিধবা পিসি বা বোন বা অন্য কোন দুঃস্থ আত্মীয় ও আত্মীয়া। যোগাযোগ ও পরিবহনের সুবিধা হবার পর মানুষ যখন কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়ে বসবাস সুরু করলো, তখন থেকেই ভারতের এই সনাতন পরিবারের ভাঙ্গন ঘটলো।

একই রকমের পরিবার ভারতের সর্বত্র দেখা যায় না। উপরে যে পরিবারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় পিতৃশাসিত-পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার। দেশের অধিকাংশ স্থানেই এই পরিবার দেখা যায়। পিতৃশাসিত-পিতৃকেন্দ্রিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য এই যে, এরূপ পরিবারে বংশপরম্পরা নির্ণীত হয় পিতা, পুত্র বা পৌত্রের মাধ্যমে। এক কথায়, এরূপ পরিবারে বংশপরম্পরা নেমে আসে পুরুষের দিক দিয়ে। সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে গঠিত যে পরিবার ভারতে দেখা যায়, তাকে বলা হয় মাতৃশাসিত-মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার। এরূপ পরিবারে বংশপরম্পরা নির্ণীত হয় মেয়েদের দিক দিয়ে, মাতা, কন্যা, দৌহিত্রী ইত্যাদির মাধ্যমে। মাতৃশাসিত-মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার গঠিত হয় স্ত্রীলোক স্বয়ং, তার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এবং নিজের ও ভগিনীদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে। পিতৃশাসিত পিতৃকেন্দ্রিক

পরিবারের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, বিবাহের পর স্ত্রী এসে বাস করে তার স্বামীর গৃহে। কিন্তু মাতৃশাসিত মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারে এরূপ ঘটে না। এই পরিবারের কোন স্ত্রীলোক বিবাহের পর অন্যত্র গিয়ে বাস করে না। এরূপ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত পুরুষদের স্ত্রীরা এবং স্ত্রীলোকদিগের স্বামীরা অন্য পরিবারে বাস করে। স্ত্রীলোকদের স্বামীরা মাত্র সময় সময় আসা যাওয়া করে। বলা বাহুল্য পিতৃশাসিত পিতৃকেন্দ্রিক পরিবারে স্ত্রী স্বামীর ও সন্তানরা পিতার সাহচর্য পায়। মাতৃশাসিত মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারে তা পায় না।

পিতৃশাসিত পিতৃকেন্দ্রিক পরিবারই ভারতে প্রাধান্য লাভ করেছে। উত্তর ভারতের সর্বত্র এই পরিবারই দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ স্থলেও তাই। তবে দক্ষিণ ভারতে এমন অনেক জাতি ও উপজাতি আছে যাদের মধ্যে মাতৃশাসিত মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারই প্রধান। এরূপ জাতির অন্যতম হচ্ছে মালাবার উপকূলের নায়ার ও তিয়ান জাতি এবং কর্ণাটকের বানট্ ও তুলুভাষাভাষী অনেক জাতি। তামিল নাড়ুর পরিবার প্রধানত পিতৃকেন্দ্রিক ও পিতৃশাসিত। তবে তামিল নাড়ুর দক্ষিণ অঞ্চলে এমন কয়েকটি জাতি আছে যাদের মধ্যে উভয় বর্গের পরিবারই দেখা যায়। উত্তর ভারতে মাতৃকেন্দ্রিক মাতৃশাসিত পরিবার অত্যন্ত বিরল। বোধ হয় আসামের খাসি ও গারো জাতির পরিবারই এ সম্পর্কে একমাত্র ব্যতিক্রম।

ভারতে দু-রকমের সমাজ ব্যবস্থা দেখা যায়। আদিবাসীর সমাজ ব্যবস্থা ও হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা। উভয় রকম সমাজ ব্যবস্থাতেই পরিবার হচ্ছে ন্যূনতম সামাজিক সংস্থা। আদিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় একটি গোষ্ঠী বা দল। আবার কয়েকটি গোষ্ঠী বা দলের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় একটি উপজাতি বা ট্রাইব। হিন্দুদের মধ্যে ট্রাইবের পরিবর্তে আছে বর্ণ কিংবা জাতি। এগুলির আবার অনেক শাখা ও উপশাখা আছে।

হিন্দুর জাতিই বলুন আর আদিবাসীর ট্রাইবই বলুন, এগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্তর্বিবাহ। তার মানে, কেউ নিজ জাতি বা ট্রাইবের বাইরে বিবাহ করতে পারে না। বিবাহ করতে হলে জাতি বা ট্রাইবের ভেতরেই বিয়ে করতে হবে। তবে জাতি বা ট্রাইবের ভেতর যে কোন পুরুষ যে কোন মেয়েকে অবাধে বিয়ে করতে পারে না। এ সম্বন্ধে উভয় সমাজেই খুব সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন আছে।

আগেই বলা হয়েছে যে জাতি বা ট্রাইবগুলি কতকগুলি গোষ্ঠী বা দলে বিভক্ত। এই সকল গোষ্ঠী বা দলগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহির্বিবাহ। তার মানে কোন গোষ্ঠীর কোন ছেলে যদি বিয়ে করতে চায় তবে তাকে বিয়ে করতে হবে অন্য গোষ্ঠীর মেয়েকে, নিজের গোষ্ঠীতে নয়। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, যদি কেউ বিয়ে করতে চায়, তাহলে তাকে নিজের জাতির ভেতরেই বিবাহ করতে হবে, কিন্তু নিজের গোষ্ঠীতে নয়, অপর কোন গোষ্ঠীতে। এ নিয়ম না মানলে, কিছুকাল আগে পর্যন্ত একঘরে হয়ে থাকতে হতো এবং আগেকার দিনে একঘরে হয়ে থাকাটা এক ভয়াবহ শাস্তি ছিল।

হিন্দুদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি চিহ্নিত হয় গোত্রপ্রবর দ্বারা। আর আদিবাসী সমাজে এগুলি চিহ্নিত হয় টটেম দ্বারা। টটেম বলতে গোষ্ঠীর রক্ষকস্বরূপ কোন শুভসাধক পরমাত্মাকে বোঝায়। এই পরমাত্মা কোন বৃক্ষ, প্রাণী বা জড়পদার্থের মধ্যে নিহিত থাকে। আদিবাসীদের বিশ্বাস যে, গোষ্ঠীসমূহের উৎপত্তি হয়েছে এই সকল বিশেষ প্রাণী, বৃক্ষ বা জড় পদার্থ থেকে। যে প্রাণী বা বৃক্ষ, যে গোষ্ঠীর টটেম, তাকে তারা বিশেষ শ্রদ্ধা করে। কখনও তাকে বিনাশ করে না। সেই প্রাণীর মাংস বা সেই বৃক্ষের ফল কখনও খায় না।

একই টটেমের ছেলেমেয়েরা কখনও পরস্পরকে বিয়ে করতে পারে না। বিয়ে করতে হলে তাদের ভিন্ন টটেমে বিয়ে করতে হয়। কিন্তু আদিবাসী সমাজে সবজায়গাতেই যে বহির্বিবাহের বিধি টটেমের

উপর প্রতিষ্ঠিত, তা নয়। কোন কোন জায়গায় এগুলি আরাধনা পদ্ধতির উপর স্থাপিত। মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডজাতির কোন কোন শাখার মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলিকে “বংশ” বলা হয়। যে বংশ যত সংখ্যক দেবদেবীর পূজা করে, তার দ্বারাই সে বংশ চিহ্নিত হয়। দুই বংশের দেবদেবীর সংখ্যা যদি সমান হয়, তা হলে তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। মনে করুন, যে “বংশ” সাতটি দেবদেবীর পূজা করে, তাদের ছেলেমেয়েকে বিবাহ করতে হলে, সাত ভিন্ন অন্য সংখ্যক দেবদেবীতে পূজারত “বংশে” বিয়ে করতে হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বহি-র্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি গ্রাম বা অঞ্চল ভিত্তিতেও চিহ্নিত হয়। যেমন— ছোটনাগপুরের মুণ্ডাজাতির মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, নিজের গ্রামে কেহ বিবাহ করতে পারবে না। ওড়িষ্যার খণ্ডজাতির মধ্যেও অনুরূপ নিয়ম আছে। খণ্ডদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠী গুলিকে “গোচী” বলা হয়। গোষ্ঠীগুলি এক একটা “মুতা” বা গ্রামের নাম অনুযায়ী চিহ্নিত হয়। তাদের এই বিশ্বাস যে, একই গোষ্ঠীর সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত—এই কারণে তাদের মধ্যে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, সুতরাং তাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ হতে পারে না। হলে সেটা অনাচার হবে। নাগাল্যাণ্ডের অনেক জাতির মধ্যেও এইরূপ গ্রামভিত্তিক বহির্বিবাহ গোষ্ঠী আছে। সেগুলিকে সেখানে “খেল” বলা হয়। বলা বাহুল্য কেহ নিজ খেলের মধ্যে বিবাহ করতে পারে না। বরোদার কোলিজাতির মধ্যেও নিজ গ্রামে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে তাদের মধ্যে একটা গ্রাম-ক্রম দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে “ক” গ্রামের মেয়ের বিয়ে হয়, “খ” গ্রামের ছেলের সঙ্গে আবার “খ” গ্রামের মেয়ের বিয়ে হয় “গ” গ্রামের ছেলের সঙ্গে, এইরূপ ক্রমে। বরোদার হিন্দুদের মধ্যেও কোন কোন জায়গায় গ্রাম অনুগামী বহির্বিবাহ প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে রাজপুত ও লেওয়া কুম্বীরা কখনও নিজ গ্রামে বিয়ে করে না। আবার দক্ষিণ ভারতের তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে এর বিপরীত প্রথা দেখা যায়।

সেখানে কিছুকাল আগে পর্যন্ত নিজ গ্রাম ছাড়া অপর গ্রামে কেহ বিবাহ করতে পারতো না।

আগেই বলা হয়েছে যে হিন্দুদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি চিহ্নিত হয় "গোত্রপ্রবর" দ্বারা। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এগুলি আখ্যাত হয় কোন পূর্বপুরুষ ঋষির নামে। ব্রাহ্মণেতর জাতিদের মধ্যে কুলপুরোহিতের গোত্রই অবলম্বিত হয়।

উত্তর ভারতের হিন্দুসমাজে বিবাহ, গোত্রপ্রবর বিধি নিষেধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সগোত্রে বিবাহ কখনও হয় না। তামিল নাড়ুর ব্রাহ্মণরাও গোত্রপ্রবর বিধি অনুসরণ করে। কিন্তু পশ্চিম ভারতের মারাঠারা ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজভুক্ত কোন কোন জাতি গোত্রপ্রবর বিধি অনুসরণ করে না। তাদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলিকে "দল" বলা হয় এবং সেগুলি টটেম অনুকল্প কোন প্রাণী, বৃক্ষ বা জড়পদার্থ দ্বারা চিহ্নিত হয়।

হিন্দু সমাজে অবাধ বিবাহের অপর এক প্রতিবন্ধকতা আছে। সেটা হচ্ছে রক্তের একমূলতা সম্পর্কিত দ্বিপার্শ্বিক বিধি। একে সপিণ্ড বিধান বলা হয়। সপিণ্ড বিধি বিশেষভাবে প্রচলিত আছে উত্তর ভারতে। এই বিধান অনুযায়ী সপিণ্ডদের মধ্যে কখনও বিবাহ হয় না। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিবাহ ব্যাপারে সর্বত্রই সপিণ্ড বর্জন করে। সপিণ্ড বলতে পিতৃকুলে উর্ধ্বতন সাত-পুরুষ ও মাতৃকুলে উর্ধ্বতন পাঁচ-পুরুষ বোঝায়। অঙ্ক কষে দেখা গেছে যে এই নিয়ম পালন করতে গেলে, অগণিত সম্ভাব্য জ্ঞাতির সঙ্গে বিবাহ পরিহার করতে হয়। এজন্য বর্তমানে সপিণ্ড বিধিকে সংক্ষেপ করে তিন-পুরুষে দাঁড় করান হয়েছে।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত হিন্দুসমাজে গোত্রপ্রবর বিধি ছাড়া অবাধ বিবাহের আর এক বাধা ছিল। তাহা কৌলীন্য প্রথা। কৌলীন্য প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বাংলাদেশে ও মিথিলায়। আদিবাসী সমাজেও কোন কোন জায়গায় কৌলীন্য প্রথা দেখা যায়। কৌলীন্য

প্রথায়, বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি মর্যাদার তারতম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথানুযায়ী উচ্চতর গোষ্ঠীভুক্ত মেয়ের বিবাহ, কুলীন গোষ্ঠীতে দেওয়া চাই। হীনতর মর্যাদাবিশিষ্ট গোষ্ঠীতে দিতে পারা যায় না। দিলে তাকে পতিত হতে হতো। সেজন্য যে সমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকে, সে সমাজে কন্যাব বিবাহের জন্য পাত্র পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত কুলীন কন্যার বিবাহ হতো না। এ কারণে কোন কোন স্থানে কৌলীন্য-কলুষিত সমাজে শিশুকন্যা হত্যা প্রচলন ছিল। আবাব কোন কোন স্থলে, যেমন—বাংলাদেশে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাইকারী হাবে বহুবিবাহ দ্বারা কৌলীন্যেব কঠোর বিধান এড়ান হতো। এরূপ শোনা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে গঙ্গাযাত্রী কুলীন বৃদ্ধেব সঙ্গে কুলীন কন্যাব বিবাহ দিয়ে কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষা করা হতো।

এছাড়া বাংলাদেশের উচ্চবর্ণেব কোন কোন জাতির মধ্যে আরও কতকগুলি কঠিন প্রতিবন্ধক ছিল। এ সকল জাতির মধ্যে বিবাহ কোন বিশেষ শ্রেণী বা পর্যায়েব মধ্যে হওয়ার রীতি ছিল। যেমন—দক্ষিণ বাঢ়ী কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে পুত্রেব বিবাহের জন্য (এঁদের মধ্যে কৌলীন্য পুত্রগত, ব্রাহ্মণদেব মত কন্যাগত নয়) পাত্রী নির্বাচন করতে হয় সমপর্যায অপব দুই কুলীন শাখা হতে।

হিন্দুসমাজে সাধারণত পাত্র অপেক্ষা পাত্রীব বয়স কম হয়। কিন্তু পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে এই নিয়ম সব সময় পালিত হয় না। তার কারণ সেখানে “বাঞ্ছনীয়” বিবাহ প্রচলন থাকার দরুন প্রায়ই দেখা যায় যে “বাঞ্ছনীয়” পাত্রী, পাত্র অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। এরূপ ক্ষেত্রে বয়সেব তারতম্য দরুন অসামঞ্জস্য দোষ দূর করবার জন্য ছেলের সঙ্গে মেয়ের যত বছরের তফাৎ, মেয়ের বিয়ের সময় তার কোমরে তত সংখ্যক নারিকেল বেঁধে দেওয়া হয়।

বিবাহে সপিণ্ড এড়ানোর নিয়ম দক্ষিণ ভারতে পূর্ণ মাত্রায় পালন

করা হয় না। কেননা দক্ষিণ ভারতে বহু জাতির মধ্যে পিসতুতো বোন বা মামাতো বোনকে বিবাহ করতে হয়। অনেক জায়গায় আবার মামা ভাগ্নীর মধ্যেও বিবাহ হয়। বাধ্যতামূলক না হলেও এটাই হচ্ছে সেখানে “বাঞ্ছনীয়” বিবাহ। মামাতো বোনকে বিয়ে করার রীতি অবশ্য মহাভারতের যুগেও ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্জুনেব সঙ্গে সুভদ্রার, শিশুপালেব সঙ্গে ভদ্রার, পরীক্ষিতের সঙ্গে ইরাবতীব বিবাহের উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণ মারাঠাদেশে ন্যূনপক্ষে ৩১টি জাতি আছে, যারা মামাতো বোনকে বিয়ে করে। আদিবাসীদের মধ্যেও কোথাও কোথাও এরূপ বাঞ্ছনীয় বিবাহ প্রচলিত আছে। মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড, বাইগা ও আশারিয়াদের মধ্যে পিসতুতো বোনকে বিবাহ করার প্রথা আছে। এখানে এরূপ বিবাহকে “দুধ লৌটনা” বলা হয়। তার অর্থ এই যে, মেয়ের বিয়ের জন্য কোন পরিবারের যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তা পূরণ কবতে হবে অপর পরিবারকে মেয়ে দান করে। এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পাবে যে আদিবাসী সমাজে স্ত্রীলোক আর্থিক সম্পদ বিশেষ, কেননা স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে শ্রম করে। মারিয়া গোণ্ডদেব মধ্যে পিসতুতো বোনকে যদি বিবাহের জন্য মামাতো ভাইয়ের হাতে না দেওয়া হয়, তা হলে সে ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত হস্তক্ষেপ করে এবং জোব করে দুজনের মধ্যে বিবাহ দিয়ে দেয়। সিকিমেব ভুটিয়ারা মাতৃকুলে বিবাহ করে। কিন্তু পিসির কুলে কখনও বিবাহ করে না। হো ও সাঁওতালদের মধ্যে পিসতুতো-মামাতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহের একটা বৈশিষ্ট্যমূলক নিয়ম আছে। এদের মধ্যে মামা যতদিন জীবিত থাকে ততদিন মামার মেয়েকে বিয়ে করা চলে না। অনুরূপ-ভাবে পিসি যতদিন জীবিত থাকে ততদিন পিসির মেয়েকেও বিবাহ করা যায় না।

যদিও বর্তমানে একপত্নীত্বই একমাত্র আইনসিদ্ধ বিবাহ বলে পরিগণিত হয়েছে তা হলেও কিছুকাল আগে পর্যন্ত হিন্দু সমাজে

বহুপত্নী গ্রহণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে বহুপতি গ্রহণও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বহুপতিগ্রহণ প্রচলিত আছে দক্ষিণ ভারতে টোডাদের মধ্যে ও উত্তর ভারতে খস্‌জাতির মধ্যে। বহুপতিক বিবাহ দুরকমের হতে পারে। যেখানে স্বামীরা সকলেই সহোদর ভাই, সেখানে এরূপ বিবাহকে ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিক বিবাহ বলা হয়। যেখানে স্বামীরা সকলে ভাই নন, সেখানে তাকে অভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিক বিবাহ বলা হয়। উত্তর ভারতের খস্‌জাতির মধ্যে ও দক্ষিণ ভারতে টোডাদের মধ্যে যে বর্গের বহুপতিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তা ভ্রাতৃত্বমূলক। আবার মালাবারের নায়ারদের মধ্যে ও উত্তরে তিব্বতীয়দের মধ্যে যে বর্গের বহুপতিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তা অভ্রাতৃত্বমূলক। এ সকল ক্ষেত্রে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণীত হয় এক সামাজিক অনুষ্ঠানের দ্বারা। আবার অনেকস্থলে দেবর কর্তৃক বিধবা ভাবীকে বিবাহ করার রীতিও আছে। এরূপ বিবাহকে দেবরণ বলা হয়। আবার অনুরূপভাবে যেখানে স্ত্রীর ভগিনীদের বিবাহ করা হয় তাকে শালীবরণ বলা হয়। বর্তমানে বহু জাতির মধ্যে এরূপ বিবাহের প্রচলন আছে। এক সময় বাংলাদেশেও প্রচলিত ছিল।

ভারতে বিবাহ প্রথার বিচিত্রতার কারণ হচ্ছে, নানাজাতি ও কৃষ্টির সমাবেশ। অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা জাতির লোক এসে ভারতের জনস্রোতে মিশেছে। তার ফলে, ভারতে নানা নরগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটেছে। এদের মধ্যে আছে, অষ্ট্রালয়েড বা প্রাক্‌-দ্রাবিড়, দ্রাবিড়, আর্য ও মঙ্গোলীয়। অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর লোকেরাই হচ্ছে ভারতের আদিবাসী। তারা আজ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে মধ্য ভারতে।

১৯৬০ সালে লোক গণনার সময় এদের সংখ্যা ছিল ২,৯৮,৮৩,৪৭০ জন। ভারতের সমগ্র জনবাসীর ৬·৮৬ শতাংশ। আদিবাসীরা সাধারণতঃ অষ্ট্রএশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দুই প্রধান শাখার ভাষা সমূহে কথাবার্তা বলে। এই দুই প্রধান শাখা হচ্ছে মুণ্ডারী ও

মন্‌খেমর। ছোট নাগপুরের আদিবাসীরা মুণ্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহে কথাবার্তা বলে। এর উপশাখা সমূহ হচ্ছে থারওয়ারী, কোরফা, খরিয়া, জুয়াঙ, শবর ও গডব। আবার থারওয়ারীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সাঁওতালী, হর, ভূমিজ, কোরা, হো, তুরিম, আসুরী, আগারিয়া ও কোরওয়া। সাঁওতালী ভাষায় কথা বলে সাঁওতাল পরগণার অধিবাসীরা। বাকীগুলি প্রচলিত আছে ওড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের নানা উপজাতির মধ্যে। দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলে। তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কোডাগু, তুলু, টোডা ও কোটা। তবে ছোটনাগপুরের ওরাঁওরাও দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে। এরূপ অনুমান করবার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে আগন্তুক জাতিসমূহের মধ্যে দ্রাবিড় জাতিই প্রথম ভারতে এসে বসবাস সুরু করে এবং তার অনেক পরে আসে আর্যরা। আর্যরা এসে বসবাস সুরু করে পঞ্চনদ উপত্যকায় এবং পরে ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর উপত্যকায়। তাঁরাই ভারতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রবর্তন করেন এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম ও জাতিভেদের সৃষ্টি করেন। দ্রাবিড় জাতি বর্তমানে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে দক্ষিণ ভারতে আর মঙ্গোলীয় জাতি সমূহ বাস করে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে।

যুগ যুগ ধরে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ভারতীয় কৃষ্টি আজ নানা জাতির ছাপ বহন করছে। পরবর্তী অধ্যায় সমূহে আমরা দেখতে পাব যে এর প্রভাব বিবাহ রীতিনীতির উপরও প্রতিফলিত হয়েছে।

বিবাহ সমস্যার উপর যৌন অনুপাতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যৌন অনুপাত বলতে আমরা হাজার পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা বুঝি। স্ত্রীলোকের সংখ্যা যেখানে কম সেখানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে পাত্রী সংগ্রহ করা, আর যেখানে পুরুষের সংখ্যা কম সেখানে পাত্র সংগ্রহ করাই প্রধান সমস্যা দাঁড়ায়।

গত ৭০ বৎসর পুরুষের তুলনায় ভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা

ক্রমশ কমতে আরম্ভ করেছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে হাজার পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৯৭২ জন। এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৯১১ সালে ৯৬৪ জনে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৫৫ জনে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৫০ জনে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৪৬ জনে, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৯৪১ জনে ও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৯৩২ জনে। যে দেশে বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল এবং বহুপত্নী গ্রহণেরও কোন অন্তরায় ছিল না, সেদেশে যে এককালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক ছিল, সেরূপ অনুমান করবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে। কি কারণে গত ৭০ বৎসরকাল ভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, তা অনুসন্ধানের বিষয়। তবে এ সম্বন্ধে জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে যদিও ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে তথাপি কয়েকটি রাজ্যে যেমন কেরালা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও ত্রিপুরায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আদিবাসীদের মধ্যে পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। আরও দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণের জাতিসমূহ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের জাতিসমূহের মধ্যেও পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। আবার শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। এর কারণ অবশ্য স্বাভাবিক। কেননা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আগন্তুক পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী।

যে সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নেই, সে সমাজে স্ত্রীলোকের অনাধিক্য বিবাহ সমস্যার উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া ঘটায়, বিশেষ করে পাত্রী সংগ্রহ সম্পর্কে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, বিয়ের বয়সের পরিবর্তন হেতু। বিয়ের বয়স আগেকার দিনে খুব কমই হতো। মনুর বিধান ছিল যে বিবাহের জন্য মেয়ের বয়স আট হবে, আর ছেলের বয়স ২৪ হবে। বিয়ের বয়সের দিক থেকে স্মৃতিকাররা মেয়েদের পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম

"নগ্নিকা" অর্থাৎ যখন সে নগ্ন হয়ে থাকে, দ্বিতীয় "গৌরী" অর্থাৎ আট বছরের মেয়ে, তৃতীয় "রোহিনী" অর্থাৎ নয় বছরের মেয়ে, চতুর্থ "কন্যা" অর্থাৎ দশ বছরের মেয়ে এবং পঞ্চম "রজস্বলা" অর্থাৎ দশ বছরের উপর বয়সের মেয়ে। যদিও মনু মেয়েদের পক্ষে আট বছর ও পুরুষদের ২৪ বছর বয়স বেঁধে দিয়েছিলেন, উত্তরকালে কার্যত এ বয়স বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে অনেক কমে গিয়েছিল। তার ফলে হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহই প্রচলিত প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। সম্প্রতি যদিও এর পরিবর্তন ঘটেছে, তথাপি কিছুদিন আগে পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িষ্যায় বাল্যবিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে উচ্চবর্ণের জাতিসমূহের মধ্যে এবং বিশেষ করে শিক্ষিতসমাজে বিবাহ আর অল্প বয়সে হয় না। আজকাল মেয়েদের বিবাহ আকছার ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে হচ্ছে। অনেকে আবার আজীবন কুমারীও থেকে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে পুরুষদের বিবাহও ২৫ থেকে ৩৫-এর মধ্যে হচ্ছে এবং তাদের মধ্যেও অনেকে অবিবাহিত থাকছে।

বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান প্রজনন। সেদিক থেকে মেয়েদের প্রজননশক্তির উর্বরতার উপর বিবাহের সাফল্য ও জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে। এ সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হিন্দুদের তুলনায়. উপজাতি সমাজের মেয়েদের উর্বরতাশক্তি অনেক কম। তাদের মধ্যে প্রায়ই স্ত্রীলোকের এক থেকে তিনের বেশী সন্তান হয় না।

॥ দুই ॥

প্রাচীন ভারতে বিবাহ

হিন্দুরা যদিও দাবী করে যে তাদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহের রীতিনীতি বৈদিক যুগ থেকে অনুসৃত হয়ে এসেছে তথাপি কথাটা ঠিক নয়। গোত্র-প্রবর-সপিণ্ড বর্জন বিধি, যার উপর বর্তমান হিন্দুদের বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত, তার উল্লেখ বৈদিক যুগের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে মোটেই নেই। মনে হয়, ঋগ্বেদের যুগে বিবাহ প্রতিষ্ঠিত ছিল গ্রামভিত্তিক বহির্বিবাহের নিয়মের উপর। কেননা, ঋগ্বেদের বিবাহসংক্রান্ত স্তোত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পাত্রপাত্রী বিভিন্ন গ্রামের সহিত সংশ্লিষ্ট হতো এবং "দিধিষু" নামে এক শ্রেণীর মধ্যগের মাধ্যমে বিবাহের যোগাযোগ সাধিত হতো। নবপরিণীতা যে অন্য গ্রামের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকতো, তা তার 'বধূ' আখ্যা থেকেই বোঝা যায়। কেননা, "বধূ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যাকে বহন করে আনা হয়েছে। বৈদিকযুগের বিবাহ সম্বন্ধে আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, নবপরিণীতার বিবাহ কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে হতো না, তার সমস্ত সহোদর ভ্রাতাগণেরই সঙ্গে হতো। অন্ততঃ আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রের যুগ পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল। কেননা, আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে কন্যাকে দান করা হয় কোন এক বিশেষ ভ্রাতাকে নয়, বংশের সমস্ত ভ্রাতাকে। এজন্যই পরবর্তীকালে মনু বিধান দিয়েছিলেন যে কলিযুগে কন্যার বিবাহ যেন সমগ্র পরিবারের সঙ্গে যৌথভাবে না দেওয়া হয়। মনুর এই বিধান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, তথাকথিত কলিপূর্বযুগে কন্যার বিবাহ সমগ্র পরিবারের সহিতই সাধিত হতো। ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে এমন

কয়েকটি স্তোত্র আছে যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যদিও বধূকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিবাহ করতো, তা হলেও তার কনিষ্ঠ সহোদরগণেরও তার উপর যৌনমিলন বা রমনের অধিকার থাকতো। এই দুই গ্রন্থেই স্বামীর কনিষ্ঠভ্রাতাকে "দেবৃ" বা 'দেবর' বলা হয়েছে। এই শব্দদ্বয় থেকেও তা সূচিত হয়। কেননা 'দেবর' মানে দ্বিবর বা দ্বিতীয় বর।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের এক স্তোত্র থেকে বোঝা যায় যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তার বিধবা দেবরের সঙ্গেই স্ত্রীরূপে বাস করতো। সেখানে বিধবাকে বলা হচ্ছে, "তুমি উঠে পর, যে দেবৃ তোমার হাত ধরছে তুমি তারই স্ত্রী হয়ে তার সঙ্গে বসবাস কর।" অথর্ববেদের এক স্তোত্রেও (১০।৩।১-২) অনুরূপ কথা ধ্বনিত হয়েছে।

ভাবীর সঙ্গে দেবরের যে যৌন ঘনিষ্ঠতা থাকতো তা ঋগ্বেদের বিবাহ সম্পর্কিত স্তোত্রও ইঙ্গিত করে। উক্ত স্তোত্রে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন নববধূকে দেবৃর প্রিয়া ও অনুরাগের পাত্রী করে তোলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অপর এক স্থানেও বর্ণিত রয়েছে যে, বিধবা ভাবী দেবৃকে তাঁর দাম্পত্য শয্যায় নিয়ে যাচ্ছেন।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে ঋগ্বেদের যুগে ভাবীর সঙ্গে দেবরের যৌন সম্পর্ক ছিল কেন। আর্যরা যখন এদেশে আসেন তখন তাঁরা তাঁদের সঙ্গে খুব কমসংখ্যক মেয়েছেলে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মেয়েছেলের অভাব বিশেষভাবেই ছিল। এদেশে আসবার পর তাঁরা এদেশের অধিবাসীদের খুব ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য, গোড়ারদিকে তাঁরা এদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে কোনরূপ বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন নি। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁরা এদেশের মেয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু অন্তবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে বিবাহযোগ্যা মেয়ের অভাবের দরুন মাত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতাই বিবাহ করতেন আর অন্য ভ্রাতারা ভাবীর সঙ্গেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন।

ভাবীর উপর দেবরের এই যৌন অধিকার যে পরবর্তীকালের নিয়োগপ্রথা থেকে স্বতন্ত্র সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। বৈদিক যুগে দেবরের যে যৌন অধিকার থাকতো তা সাধারণ রমণের অধিকার। আর পরবর্তীকালের নিয়োগপ্রথা ছিল মাত্র সন্তান উৎপাদনের অধিকার। সন্তান উৎপন্ন হবার পর এ অধিকার আর থাকতো না। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, বিধবা ভাবীর উপর দেবরের এই যৌন অধিকার জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পরেও অবিকৃত থাকার দরুন ঋগ্বেদে বিধবা বিবাহের কোন উল্লেখ নেই, যা পরবর্তীকালের গ্রন্থসমূহে দেখতে পাওয়া যায়। বেদে ব্যবহৃত ও জ্ঞাতিত্ব বাচক কয়েকটি শব্দ থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকতো। 'পিতা' ও 'জনিত পিতা' এ দুটি শব্দ বেদে স্বতন্ত্র জ্ঞাতিবাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, শেষোক্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে, যে পিতা সন্তানের প্রকৃত জন্মদাতা আর প্রথম শব্দের অর্থ হচ্ছে অপর পিতা বা মাতার অন্য স্বামী। একথা বলাবাহুল্য যে, প্রকৃত পিতা হতে অপর কোন পিতা মাত্র সেই সমাজেই কল্পিত হতে পারে, যে সমাজে স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকতো। বেদে ব্যবহৃত "পিতৃতম" শব্দও অনুরূপ ইঙ্গিত করে। এর অর্থ পিতাদের মধ্যে যে অগ্রণী বা অগ্রগামী।

যে যুগের লোক দেবতাগণের বেলায় নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যেও যৌনমিলন কল্পনা করতে পারতো সে যুগে যে ভাবীর সঙ্গে দেবরের যৌনসম্পর্ক থাকবে, তা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। ঋগ্বেদে যম-যমীর কথোপকথনে দেখা যায় যে, যমের যমজ-ভগ্নী যমী যখন যমের সঙ্গে যৌনমিলন প্রার্থনা করছে, যম তখন বলছে, যেকালে ভাই-বোনে যৌনমিলন ঘটতো সেকাল অনেকদিন অতীত হয়ে গেছে। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে ভবিষ্যতে হয়তো এমন যুগ পুনরায় আসবে যখন ভাই-বোনের মধ্যে এরূপ সংসর্গ আবার বৈধ বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া ঋগ্বেদে এরূপ অস্বাভাবিক মিলনের আরও উদাহরণ আছে,যেমন

সূর্য ও উষার মিলন, অশ্বিনদ্বয় ও সূর্যার মিলন। আগেই বলা হয়েছে যে ঋগ্বেদে বিধবা বিবাহের উল্লেখ নেই। মনে হয়, অথর্ববেদের যুগে এর প্রবর্তন হয়েছিল। কেননা অর্থববেদের নবম মণ্ডলে বর্ণিত হয়েছে যে জনৈকা বিধবা মৃতস্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, যাতে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এক ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিচ্ছেন।

পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত হয়েছে যে আর্যরা দুই বিভিন্ন স্রোতে ভারতে এসেছিলেন। যাঁরা পঞ্চনদে এসে বসবাস সুরু করে ঋগ্বেদ রচনা করেছিলেন, তাঁরা এসেছিলেন পরে। আর যাঁরা আগে এসেছিলেন তাঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশে। (লেখক প্রণীত "বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়" দেখুন) মনে হয় পরবর্তীকালে আগত ঋগ্বেদের আর্যদের তুলনায় তাঁরা অনেক উদার মনভাবাপন্ন ছিলেন। সেই কারণে তাঁরা এদেশে অনার্যদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে-ছিলেন। তাঁরা বহুক্ষেত্রে যে শুধু অনার্য মেয়েদের বিবাহ করেছিলেন তা নয়, তাঁরা অজ্ঞাতকুলশীল বহু ব্যক্তিকে যেমন সত্যকাম, জবাল, মহীদাস, ঐতরেয় ইত্যাদিকে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়েছিলেন। মনে হয় অনার্য সমাজে প্রচলিত টটেম-ভিত্তিক বহির্বিবাহ গোষ্ঠী সমূহের অনুকরণে তাঁরাই গোত্র প্রবর প্রভৃতি সৃষ্টি করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ঋগ্বেদীয় আর্যরা যখন পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছিলেন তখন তাঁরা তা গ্রহণ করেছিলেন।

আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যে মেলামেশা ঘটেছিল, তা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল মহাভারতের যুগে। এর ফলে অনার্যসমাজের বিবাহপদ্ধতি সমূহ আর্যসমাজেও স্থান পেয়েছিল। ঋগ্বেদের যুগে এক রকমের বিবাহই প্রচলিত ছিল। সে বিবাহ নিষ্পন্ন হতো মন্ত্র উচ্চারণ ও যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা। কিন্তু মহাভারতীয় যুগের সমাজে এমন সব রকমের বিবাহও স্থান পেয়েছিল, যার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ বা যজ্ঞ সম্পাদনের প্রয়োজন হতো না।

মহাভারতীয় যুগে আমরা চার রকম বিবাহের উল্লেখ পাই। ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব, আসুর ও রাক্ষস। এর মধ্যে মাত্র ব্রাহ্ম বিবাহেই মন্ত্র উচ্চারণ ও যজ্ঞ সম্পাদনের প্রয়োজন হতো। বাকী তিন রকম বিবাহ-এ সবের কোন বালাই ছিল না। আবার যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু-স্মৃতিতে আমরা আট রকম বিবাহের উল্লেখ পাই। এই আট রকম বিবাহ যথাক্রমে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ব্রাহ্ম বিবাহ ছিল ব্রাহ্মণ্য আচারসম্পূত বিবাহ। এই বিবাহে মন্ত্র উচ্চারণ ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে স্ববস্ত্রা, সালংকরা ও সুসজ্জিতা কন্যাকে বরের হাতে সম্প্রদান করা হতো। প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে যে বিবাহ প্রচলিত ছিল, তার নাম ছিল আর্য বিবাহ। এই বিবাহে যজ্ঞে ব্যবহৃত ঘৃত প্রস্তুতের জন্য মেয়ের বাবাকে, বর এক জোড়া গোমিথুন উপহার দিত। যজ্ঞের ঋত্বিককে দক্ষিণা হিসাবে যেখানে কন্যাদান করা হতো, তাকে বলা হতো দৈব বিবাহ। "তোমরা দুজনে যুক্ত হয়ে ধর্মাচরণ কর" এই উপদেশ দিয়ে যেখানে বরের হাতে মেয়েকে দেওয়া হতো, তাকে বলা হতো প্রাজাপত্য বিবাহ। বলা বাহুল্য যে এই চার রকম বিবাহপদ্ধতিরই কৌলীন্য ছিল। বাকীগুলির কোন কৌলীন্য ছিল না, কেননা সেগুলি প্রাগ্‌বৈদিক আদিবাসী সমাজ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে সেগুলি আদিবাসী সমাজে এখনও প্রচলিত আছে। আসুর বিবাহ ছিল পয়সা দিয়ে মেয়ে কেনা। তার মানে যে বিবাহে কন্যাপণ দেওয়া হয়। এরূপ বিবাহে মেয়ের বাবাকে কিংবা তার অভিভাবককে পণ বা মূল্য দিতে হতো। আর মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়ে বিবাহ করা হতো, তার নাম দিল রাক্ষস বিবাহ। আর যেখানে মেয়েকে অজ্ঞান বা অচৈতন্য অবস্থায় হরণ করে এনে বা প্রবঞ্চনা অথবা ছলনার দ্বারা বিবাহ করা হতো, তাকে বলা হতো পৈশাচ বিবাহ। আর নির্জনে প্রেমালাপ করে যেখানে স্বেচ্ছায় মাল্যদান করা হতো তাকে বলা হতো গান্ধর্ব

বিবাহ। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু এই আট রকম বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন, তথাপি মহাভারতীয় যুগে উচ্চবর্ণের মধ্যে মাত্র দু-রকমের বিবাহই সাধারণত অনুষ্ঠিত হতো। তা হচ্ছে ব্রাহ্ম ও গান্ধর্ব। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব বিবাহই ছিল প্রশস্ত। মহাভারতের নায়কদের মধ্যে অনেকেই গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছিলেন। যথা : গঙ্গার সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ এইভাবেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। এইভাবেই আবার নিষ্পন্ন হয়েছিল ভীমের সঙ্গে হিরিম্বার বিবাহ, অর্জুনের সঙ্গে উলুপী ও চিত্রাঙ্গদার বিবাহ, দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার বিবাহ ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় পরীক্ষিতের সঙ্গে সুশোভনার বিবাহ। তবে রাজারাজড়ার ঘরের মেয়েদের পক্ষে স্বয়ম্বর প্রথায় বিবাহ ছিল আদর্শ। স্বয়ম্বর বিবাহ ছিল রাক্ষস বিবাহেরই একটা সুষ্ঠু সংস্করণ মাত্র। রাজারাজড়াদের মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথায় বিবাহই যে প্রশস্ত ছিল, তা আমরা কাশীরাজার তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ম্বরসভায় ভীষ্মের উক্তি থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারি। ঐ সভায় ভীষ্ম বলেছিলেন, "স্মৃতিকাররা বলেছেন যে স্বয়ম্বর সভায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাহত করে কন্যা জয় করাই ক্ষত্রিয়দের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিবাহ।" অনুরূপভাবে পাণ্ডব-ভ্রাতারা দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বর সভায় জয় করেছিলেন। একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে স্বয়ম্বর সভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য যে মাত্র আর্যকুলের রাজারাই যোগ দিতেন, তা নয়। অনার্য রাজারাও যোগ দিতেন। কেননা এরূপ স্বয়ম্বর সভা থেকেই নিষাদ-রাজ নল বিদর্ভরাজার মেয়ে দময়ন্তীকে জয় করেছিলেন। মহাভারতীয় যুগে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যে পরস্পর বিবাহের আদান-প্রদান ঘটতো সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিষাদ কন্যাকে বিবাহের উল্লেখ মহাভারতের একাধিক জায়গায় আছে। মহাভারতের অপর এক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে যে জনৈক ব্রাহ্মণ "পক্ষী" জাতির এক মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। এখানে 'পক্ষী' জাতি বলতে পক্ষী টটেম বিশিষ্ট কোন অনার্যজাতিই বোঝাচ্ছে। মহাভারতীয় যুগে

রাজারাজরারাও অনার্য সমাজ থেকে স্ত্রী গ্রহণ করতে সঙ্কুচিত হতেন না। শান্তনু তো অনার্য দাসকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। রাজা দেবক-ও এক অসবর্ণ শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

এরূপ সন্দেহ করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে মহাভারতীয় যুগের সমাজের প্রথম অবস্থায় বিবাহ সম্পাদন করবার জন্য যজ্ঞ নিষ্পাদন, মন্ত্র উচ্চারণ, সপ্তপদীগমন ইত্যাদি বিধিসম্মত কোন পদ্ধতির প্রয়োজন হতো না। পরবর্তীকালের সমাজেই এগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল। দ্রৌপদীর বিবাহ কাহিনী থেকে এটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি। পাণ্ডব-ভ্রাতারা দ্রৌপদীকে জয় করে এনে কিছুকাল তাঁর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করেছিলেন। পরে তাঁরা আবার দ্রুপদ রাজার গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন যজ্ঞ সম্পাদন ও আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য। মনে হয়, পরবর্তীকালের রীতিনীতি ও প্রথার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যই মহাভারতের মধ্যে এই অংশটি উত্তরকালে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য আচারসম্পূত বিবাহই যে কালক্রমে প্রাধান্য লাভ করেছিল, তা আমরা নারদ-পর্বত-শৃঞ্জয় উপাখ্যান, ভৃগু-পুলোমা উপাখ্যান প্রভৃতি থেকেও পরিষ্কার বুঝতে পাবি। মনে হয়, পরবর্তীকালে যখন যজ্ঞ সম্পাদন, মন্ত্র উচ্চারণ ও সপ্তপদীগমন ছাড়া অনুষ্ঠানগত বিবাহ হতে পারতো না, তখনই মহাভারতের মধ্যে এই অংশগুলি প্রবেশ করানো হয়েছিল।

আচার অনুষ্ঠানগত বিবাহ যখন প্রচলিত হলো, তখন এইরকম বিবাহের উপরই জোর দেওয়া হলো। সেজন্য আমরা দেখতে পাই যে ভৃগু যখন পুলোমাকে বিবাহ করলেন, তখন এক রাক্ষস এসে দাবী করে বললো যে, পুলোমাকে সে-ই আগে বিবাহ করেছে। এই বিবাহের মীমাংসার জন্য অগ্নিকে সাক্ষী মানা হলো। অগ্নি রাক্ষসকে বললেন—রাক্ষস, এ কথা সত্য বটে যে তুমিই পুলোমাকে প্রথম বিবাহ করেছো, কিন্তু যেহেতু তুমি মন্ত্রপাঠদ্বারা তাকে বিবাহ কর নাই, আর ভৃগু তাকে মন্ত্রপাঠ দ্বারা বিবাহ করেছে, সেইহেতু পুলোমা

ভৃগুর স্ত্রী। অপর একস্থলে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—একমাত্র যজ্ঞ সম্পাদন, মন্ত্রপাঠ ও সপ্তপদীগমন দ্বারাই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে গান্ধর্ব বিবাহে এ সকল আচার অনুষ্ঠানের কোন বালাই ছিল না। সেজন্য মনে হয় যে গান্ধর্ব বিবাহ পূর্ববর্তী-সমাজের বিবাহ। গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ সম্পর্কে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যে কথা বলেছিলেন তা থেকেও মনে হয় যে পূর্ববর্তী-কালের ক্ষত্রিয় সমাজে অনুষ্ঠানগত বিবাহের প্রাধান্য ছিল না। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বলছেন—"প্রিয়ে, তুমি আমাকে স্বামীরূপে বরণ কর। তুমি আমাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ কর। কেননা, শাস্ত্রকাররা বলেছেন যে, গান্ধর্ব বা রাক্ষস মতে বা উভয় মতের সংমিশ্রণে বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত।"

রাক্ষস বিবাহে কন্যাকে বলপূর্বক কেড়ে এনে বিবাহ করা হতো। এরূপ বিবাহের অনেক উল্লেখ মহাভারতে আছে। যথা—কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলপূর্বক হরণ করে এনে বিবাহ করেছিলেন। দেবকের রাজসভা থেকে দেবকীকে শিনি বলপূর্বক অধিকার করে এনেছিলেন বসুদেবের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য। অনুরূপভাবে দুর্যোধনের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য কলিঙ্গ-রাজার সভা থেকে চিত্রাঙ্গদাকে কর্ণ বল-পূর্বক লুণ্ঠন করে এনেছিলেন। রৈবতকে থাকাকালীন অর্জুন যখন কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বলেছিলেন, "ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বয়ম্বরই প্রশস্ত বিবাহ। কিন্তু যেহেতু সুভদ্রা কা'কে মাল্যদান করবে তা জানা নেই, সেইহেতু আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি তাকে বলপূর্বক অধিকার করে নিয়ে যাও। শাস্ত্রকাররা বীরের পক্ষে এরূপ বিবাহ সম্মানজনক বলেছেন।" এই কথা শুনে অর্জুন সুভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ করে এনে বিবাহ করেছিলেন। অর্জুনের এই আচরণে যাদবরা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে-ছিলেন, কৃষ্ণ তখন তাদের এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, "আমরা যে অর্থের বিনিময়ে কন্যা বিক্রয় করি, অর্জুনের পক্ষে এরূপ চিন্তা

কল্পনার বাইরে, স্বয়ম্বর বিবাহে অর্জুন সম্মত নয়, সেজন্য অর্জুন বলপূর্বক সুভদ্রাকে বিবাহ করেছে।" কৃষ্ণের এই উক্তি থেকে আরও প্রকাশ পাচ্ছে যে যাদবসমাজে কন্যাপণ গ্রহণের (আসুর বিবাহের) প্রচলন ছিল।

আসুর বিবাহের দৃষ্টান্ত আমরা মহাভারতের আরও অনেক জায়গায় পাই। পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য মাদ্রীকে তো মদ্ররাজ শল্যের কাছ থেকে বহু মূল্যবান জিনিসের বিনিময়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। ভৃগুমুনির ছেলে রিচিক যখন কান্যকুব্জরাজ গাধীর পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন, গাধী তখন বলেছিলেন, "আমাদের বংশের রীতি অনুযায়ী কন্যার মূল্য বাবদ তোমাকে এক হাজার তেজস্বী ঘোড়া দিতে হবে।" যযাতির মেয়ে মাধবীকে পাবার জন্যও গালবকে চার সহস্র অশ্বপণ দিতে হয়েছিল। মহাভারতের অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে যে অঙ্গদেশে কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করাই প্রচলিত রীতি ছিল।

মহাভারতীয় যুগে বিধবা ও সধবা এই উভয় অবস্থাতেই কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ সম্ভবপর ছিল। এরূপ কন্যাকে পূণর্ভূ বলা হতো। ঐরাবত দুহিতার স্বামী যখন গরুড় কর্তৃক নিহত হন তখন অর্জুন তাকে বিবাহ করে তার গর্ভে ইরাবন নামে এক সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে গৌতম ঋষি যখন জনৈক নাগরিকের গৃহে ভিক্ষার্থে এসেছিলেন, তখন তাঁকে ভিক্ষাস্বরূপ এক শূদ্রা বিধবাকে দান করা হয়েছিল। গৌতম তাকে বিবাহ করে, তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। সধবার পক্ষে দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রয়াসের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে নলের কোন সংবাদ না পেয়ে দময়ন্তী দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরা হবার চেষ্টা করেছিলেন।

মহাভারতীয় যুগে বিবাহ যদিও সবর্ণে হতো, তথাপি অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করার দৃষ্টান্ত একটু আগেই দেওয়া হয়েছে। তবে উচ্চবর্ণের কন্যার

সঙ্গে নীচবর্ণের পুরুষের বিবাহ বিরূপদৃষ্টিতে দেখা হতো। এরূপ বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হতো। এই কারণে ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত শূদ্র পুরুষের বিবাহের ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হতো তাকে চণ্ডাল বলা হতো এবং তার স্থান ছিল সমাজে সকল জাতির নীচে। একমাত্র অনুলোম বিবাহ, তার মানে উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নীচ বর্ণের কন্যার বিবাহই বৈধ বলে গণ্য হতো।

বহুপত্নী গ্রহণও মহাভারতীয় যুগে বেশ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মহাভারতের অনেক নায়কেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। যেমন ঃ যযাতি বিবাহ করেছিলেন শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে, তুষ্মন্ত বিবাহ করেছিলেন শকুন্তলা ও লক্ষ্মণাকে, শান্তনু বিবাহ করেছিলেন সত্যবতী ও গঙ্গাকে, বিচিত্রবীর্য বিবাহ করেছিলেন অম্বিকা ও অম্বালিকাকে, ধৃতরাষ্ট্র বিবাহ করেছিলেন গান্ধারী ও বৈশ্যাকে, পাণ্ডু বিবাহ করেছিলেন কুন্তী ও মাদ্রীকে এবং যুক্ত-স্ত্রী হিসাবে দ্রৌপদী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ভীম বিবাহ করেছিলেন হিরিম্বাকে এবং অর্জুন বিবাহ করেছিলেন উলুপী, চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রাকে। মগধের রাজা বৃহদ্রথও বিবাহ করেছিলেন কাশীরাজার তুই যমজ কন্যাকে। মহাভারতের একস্থলে উল্লিখিত হয়েছে যে কৃষ্ণের ১০১৬ স্ত্রী ছিল আবার অপরস্থলে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের ১৬,০০০ স্ত্রী ছিল। মহাভারতে আরও উল্লিখিত হয়েছে যে রাজা সোমকের একশত স্ত্রী ছিল।

বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত মহাভারতে মাত্র একটিই আছে। পাণ্ডব-ভ্রাতাদের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহই একমাত্র বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত নয়। কালান্তরে গৌতম বংশীয়া জটিলা সাতটি ঋষিকে এক সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন। আবার বার্ক্ষী নামে অপর এক ঋষিকন্যা এক সঙ্গে দশভাইকে বিবাহ করেছিলেন। বৈদিক যুগে আমরা দেখেছি যে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্তৃক বিবাহিতা বধূর উপর সকল ভ্রাতার এক সঙ্গেই যৌনাধিকার থাকতো। বহুপতি গ্রহণ যে এক সময় ব্যাপক ছিল তা আমরা ব্যাসের এক উক্তি থেকেও বুঝতে পারি। দ্রৌপদীর

বিবাহকালে ব্যাস বলেছিলেন "স্ত্রীলোকের পক্ষে বহুপতি গ্রহণই সনাতন ধর্ম।" ধর্মসূত্র সমূহেও এর উল্লেখ আছে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে "কন্যাকে কোন বিশেষ ভ্রাতার হাতে দেওয়া হয় না, ভ্রাতৃবর্গের হাতে দেওয়া হয়।" বৃহস্পতি এর প্রতিধ্বনি করেছেন, তবে তাঁর সময়ে এরূপ বিবাহ বিরূপদৃষ্টিতে দেখা হতো। পরবর্তীকালের স্মৃতিকাররা অবশ্য পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, "এক স্ত্রীর বহু স্বামী থাকতে পারে না।"

প্রাচীনকালে যৌনবাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া, বিবাহের পরম উদ্দেশ্য ছিল বংশরক্ষার জন্য সন্তান উৎপাদন করা। হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা" অর্থাৎ পুত্র উৎপাদনের জন্যই ভার্যাগ্রহণ করা হয়। সেজন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই চরম আকাঙ্ক্ষা থাকতো সন্তান লাভ করা। জরৎকারুমুনি যখন বহু বৎসর তপস্যায় নিযুক্ত থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করছিলেন, তখন তাঁর সামনে তাঁর পূর্বপুরুষরা আবির্ভূত হয়ে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "বৎস, ব্রহ্মচর্য পরিহার কর। বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন কর। তাতে আমাদের অশেষ মঙ্গল হবে।" এই কারণে বহুপুত্র লাভই সকলের চরম আকাঙ্ক্ষা হতো। অগস্ত্য যখন বিদর্ভ রাজকন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "প্রিয়ে, তোমার অভিলাষ বল, তুমি আমা-দ্বারা কতগুলি সন্তানের জননী হতে চাও, একটি, না একশত, না এক সহস্র।" এ সম্পর্কে মহাভারতে বর্ণিত মহাতপামুনির কন্যা শুভ্রার কাহিনীও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বহুবর্ষ তপস্যার পর শুভ্রা যখন স্বর্গে যেতে চাইলেন, নারদ তখন তার সামনে এসে তাকে বললেন যে, "অনূঢ়া কন্যা কখনও স্বর্গে যেতে পারে না।" তাই শুনে শুভ্রা গালবমুনির পুত্র প্রাকশৃঙ্গকে বিবাহ করেন। মোট কথা, মহাভারতীয় যুগে বিবাহ ছিল বাধ্যতামূলক। যথাসময়ে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়ার উপর বিশেষ-ভাবে জোর দেওয়া হতো। আমরা দেখতে পাই যে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে

উপদেশ দিচ্ছেন, "পুত্র বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হলেই, পিতার কর্তব্য তার বিবাহ দেওয়া।" অপর এক স্থানে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, যে ব্যক্তি উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে যথাসময় কন্যার বিবাহ দেয় না, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হত্যার পাপে লিপ্ত হয়।

বিবাহের পূর্বে মেয়েদের যৌনসংসর্গ মহাভারতীয় যুগে অনু-মোদিত হতো। বোধ হয় আগেকার যুগেও হতো। কেন-না ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখতে পাই যে মহর্ষি সত্যকামের মাতা জবালা যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন। মহাভারতে এরূপ সংসর্গের দৃষ্টান্ত স্বরূপ সত্যবতী পরাশরের কাহিনী বিবৃত করা যেতে পারে। উপরিচর বসুর কুমারী কন্যা সত্যবতী যৌবনে যমুনায় খেয়া পারাপারের কাজ করতেন। একদিন পরাশরমুনি তার নৌকায় উঠে তার অপরূপ সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তার সঙ্গে যৌনমিলন প্রার্থনা করলেন। সত্যবতী তখন পরাশরকে বললেন, "নৌকার মধ্যে আমি কি ভাবে যৌনকর্মে রত হবো, কেন-না তীর হতে লোকেরা আমাদের দেখতে পাবে।" পরাশর তখন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেন ও তারই অন্তরালে তার সঙ্গে যৌনমিলনে রত হন। এর ফলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসের জন্ম হয়েছিল। পরাশর সত্যবতীকে বর দেন যে এই সংসর্গ সত্ত্বেও সে কুমারী থাকবে। কুন্তী-ও কুমারী অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে মিলনের ফলে পুত্র কর্ণকে প্রসব করেছিলেন। এক্ষেত্রেও দুর্বাশামুনির বরে কুন্তী তাঁর কুমারীত্ব হারান নি। মাধবী-গালব উপাখ্যানেও আমরা দেখতে পাই যে, প্রতি সন্তান প্রসবের পর মাধবীর কুমারীত্ব অটুট ছিল। বিবাহের পূর্বে মেয়েদের যৌনসংসর্গ যে সমাজে বরদাস্ত হতো, তা বিবাহের পূর্বে প্রসূত সন্তানের "আখ্যা" থেকেই বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণ কর্ণকে বলছেন, 'কুমারী মেয়ের দু-রকম সন্তান হতে পারে।' (১) কানীন ও (২) সহোঢ়। যে সন্তানকে কুমারী বিবাহের পূর্বেই প্রসব করে তাকে বলা হয় কানীন। আর যে সন্তানকে কুমারী বিবাহের পূর্বে গর্ভে ধারণ করে বিবাহের পরে প্রসব করে তাকে বলা হয়

সহোঢ়। মহাভারতের অপর এক জায়গায় ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, কুমারী যে সন্তানকে বিবাহের পূর্বে প্রসব করে তাকে বলা হয় কানীন আর যে সন্তানকে বিবাহের পরে প্রসব করে তাকে বলা হয় অরোঢ়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মহাভারতীয় যুগে কুমারী কন্যার পক্ষে গর্ভধারণ করা বিশেষ নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না।

মহাভারতীয় যুগে বিবাহিতা নারীর পক্ষে স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের সঙ্গে যৌনসংসর্গও নিন্দিত ছিল না। সুদর্শন উপাখ্যানে দেখতে পাওয়া যায় যে, অতিথির সন্তোষ বিনোদনের জন্য গৃহের গৃহিণীর পক্ষে অতিথির নিকট আত্মদেহ নিবেদন করা প্রচলিত রীতি ছিল। সন্তান উৎপাদনের জন্যও স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত যৌনমিলনের রীতিও ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর এই ধরনের যৌন মিলনতো ঘটতোই, স্বামী জীবিত থাকাকালীনও যে এরূপ মিলন ঘটতো তারও দৃষ্টান্ত আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র উৎপাদনের জন্য অপরের সহিত যৌন মিলনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পাবে যে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর মাতা সত্যবতী ভীষ্মকে ভ্রাতৃজায়াদ্বয় অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে আদেশ দিয়েছিলেন। ভীষ্ম যখন এর অনুমোদন করলেন না, তখন তাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যাসকে আহ্বান করা হয়। ব্যাস অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে দুটি সন্তান ও তাঁদের দাসীর গর্ভে আর একটি সন্তান উৎপাদন করেন। শতশৃঙ্গ পর্বতের নির্জনে পাণ্ডু কুন্তীকে আদেশ করেছিলেন, "তুমি, অপরের সহিত সঙ্গম করে সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা কর, কেন-না শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে প্রয়োজন হলে নারী তাঁর দেবরের সহিত মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন করতে পারে।" কুন্তীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য ধর্মকে আহ্বান করা হয়েছিল। ধর্মের সহিত কুন্তীর সঙ্গমের ফলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়েছিল। পরে পাণ্ডুর ইচ্ছানুক্রমে কুন্তী বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে ভীম ও অর্জুনকে উৎপাদন করান। পাণ্ডুর অপর স্ত্রী মাদ্রীও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত

মিলিত হয়ে দুটি সন্তান নকুল ও সহদেবকে উৎপাদন করিয়েছিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কলমাশপাদের স্ত্রীর গর্ভে বশিষ্ঠ একটি সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। নমস্যা ঋষিপত্নীরাও এরূপ যৌন সংসর্গ বা যৌন আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত ছিলেন না। কথিত আছে যে মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথকে নিজ স্ত্রীগণের সহিত নদীতে যৌনকেলি করতে দেখে জামদগ্ন ঋষির স্ত্রী রেণুকা রাজার প্রতি অত্যন্ত কামাতুর হয়ে উঠেছিলেন।

রামায়ণ ও বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে বিবাহের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা যেতে পারে। রামায়ণী যুগে রাজা-রাজদের মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথায় বিবাহ করাই প্রচলিত রীতি ছিল। তবে বলপূর্বক হরণ করে এনেও যে বিবাহ করা হতো তা রাবণ সীতার উপাখ্যান থেকে বুঝতে পারা যায়। ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করার রীতিও যে ছিল, তা সুগ্রীব কর্তৃক মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর স্ত্রী তারার বিবাহ থেকে বোঝা যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর সহিত বিভীষণের বিবাহও এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ যুগে সহোদরা ব্যতীত অন্য ভগিনীকে বিবাহ করার রীতিও প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্কে রামায়ণে অন্তত একটি দৃষ্টান্ত আছে। রাজা দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ। দশরথ কোশল রাজবংশের নৃপতি ছিলেন। কৌশল্যাও যে সেই বংশেরই কন্যা ছিলেন, তা তাঁর নাম থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং নিজবংশেই যে রাজা দশরথ বিবাহ করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দশরথের বিবাহ যে ভগিনীর সহিত হয়েছিল, তা দশরথ-জাতকেও উল্লিখিত হয়েছে। বস্তুত বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ সমূহে উত্তর ভারতের পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে এরূপ ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহের বহু কাহিনী নিবদ্ধ আছে। যেমনঃ নন্দিতা বিবাহ করেছিল তার মাতুল কন্যা রেবতীকে। অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত জৈন সাহিত্যেও এরূপ বিবাহের উল্লেখ আছে। শালিবরণ বা শ্যালিকাকে বিবাহ করার রীতিও যে

ছিল, তা নাভী কর্তৃক দুই যমজ ভগিনীর বিবাহ থেকে বুঝতে পারা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে এই দুই যমজ ভগিনীর অন্যতরা মরুদেবী জৈন তীর্থংকর ঋষভের মাতা ছিলেন। বসুদেব কর্তৃক দেবক রাজার সাত কন্যাকে বিবাহ ও কংশ কর্তৃক জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ ও শালিবরণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমরা আগেই দেখেছি যে বৈদিক যুগে ভাবীর উপর দেবরের যৌন সংসর্গের অধিকার ছিল। এই কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে "দত্তক" গ্রহণের প্রশ্ন বৈদিক যুগে উঠতো না। কিন্তু পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার সহিত অবাধ মিলনের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এবং মাত্র "নিয়োগ" প্রথার ভেতর দিয়ে তাকে এরূপ সংসর্গের সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত যৌনমিলনের যে দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে মহাভারত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, ঐ যুগে স্ত্রীলোকের সতীত্বের অন্য তাৎপর্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষ করে রামায়ণী যুগের সমাজে সতীত্বের অন্যরূপ মূল্যায়ন করা হয়েছিল। পতিব্রতা স্ত্রীলোককেই সতী বলা হতো। উত্তরকালের হিন্দুসমাজ সতীত্বের এই মূল্যায়নই গ্রহণ করেছিল এবং একমাত্র পতিব্রতা স্ত্রীলোককেই সতী বলে গণ্য করা হতো। কোন স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্পর্কে সংশয় হলে তাকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো। সীতাকে এইরূপ অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তবে সীতার অগ্নিপরীক্ষার যে প্রণালী রামায়ণে বিবৃত হয়েছে, তা ছাড়াও আর এক রকমের অগ্নিপরীক্ষা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। কোন নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হলে, তাকে লাঙ্গলের অগ্নিতপ্ত লৌহশলা লেহন করে নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করতে হতো। জিহ্বা দগ্ধ না হলে, সে নারী যে যথার্থই সতী তা প্রমাণ হয়ে যেতো।

॥ তিন ॥

যৌনাচারের উপর স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাব

পূর্ব অধ্যায়ে মহাভারতীয় যুগের বিশ্রস্ত যৌনজীবনের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে, তা নানারকম ভাবে বিধান ও অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল স্মৃতি ও পুরাণের যুগে। স্মৃতি বলতে হিন্দুদের বিধান শাস্ত্রসমূহকে বোঝায়। এগুলির অপর নাম ছিল ধর্মশাস্ত্র। এগুলি সনাতন ধর্মের আধার। পুরাণগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যের সংগ্রহ ভাণ্ডার। ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে যাঁরা প্রাধান্য লাভ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি, নারদ ও আপস্তম্ভ। তবে এগুলির মধ্যে মনু রচিত মানব ধর্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতাই হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, আচার ব্যবহার ও বিধানের আদর্শ নির্দেশক গ্রন্থ। হিন্দুর কাছে মনুর বিধানই শিরোধার্য। একথা বৃহস্পতি স্বীকার করে গেছেন। বৃহস্পতি বলেছেন, “মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ণ প্রশস্যতে।” তার মানে, যে স্মৃতি মনুর বিপক্ষে .বিধান দেয়, সে স্মৃতি স্মৃতিই নয়। যদিও মনুর উক্তিসমূহ অতি প্রাচীন, তথাপি সংগৃহীত অবস্থায় মনুর মানব-ধর্মশাস্ত্র অনেক পরে সংকলিত হয়েছিল। কথিত আছে, সর্বপ্রথম এতে একলক্ষ শ্লোক ছিল, কিন্তু এখন মাত্র ২,৬৮৪টি শ্লোক আছে। পণ্ডিতমহল এরূপ অনুমান করেন যে ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ সমূহ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম শতকের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল।

মনুর মানবধর্মশাস্ত্রে যে সমাজবিন্যাসের চিত্র দেওয়া হয়েছে, তা চতুবর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত। চতুবর্ণ বলতে মৌলিক চারটি শ্রেণীকে বোঝাতো, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তবে মানবধর্ম শাস্ত্রের দশম অধ্যায়ে এক সম্প্রসারিত সমাজের চেহারাও দেখতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত চারিবর্ণের মধ্যে অসবর্ণ যৌনসংসর্গের ফলে অনেক

সংকরজাতির উদ্ভব হয়েছিল। দশম অধ্যায়ে এই সকল সংকর জাতির যে নাম দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে মুর্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য, করণ বা কায়স্থ অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য, অয়োগব, ধিগবন, পুক্কস ও চণ্ডাল। এদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বা বৃত্তি ছিল। সুতরাং বৃত্তিভিত্তিক জাতি বা শ্রেণীর উদ্ভব এযুগেই হয়েছিল।

স্মৃতিকারদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবাহ ছিল ধর্মবিহিত কর্তব্য কর্ম বা সংস্কার। সকল ব্যক্তির পক্ষেই এই কর্তব্য পালন বাধ্যতামূলক ছিল, বিশেষ করে নরক থেকে পিতৃ-পুরুষদের উদ্ধারের নিমিত্ত পুত্র উৎপাদন করবার জন্য। যদিও মনুসংহিতায় আট রকম বিবাহেব উল্লেখ করা হয়েছে এবং আপস্তম্ভ ও বশিষ্ঠ ছয় রকম বিবাহের অনুমোদন করেছেন, তথাপি মাত্র সেই বিবাহকেই স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে শাস্ত্রসম্মত বিবাহ বলে গণ্য কবা হতো, যে বিবাহে মন্ত্র উচ্চারিত হতো, হোম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো ও সপ্তপদীগমণ অবলম্বিত হতো। এরূপ বিবাহকে শাস্ত্রে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হতো। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই বিবাহই প্রশস্ত বিবাহ ছিল। তবে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে আসুর বিবাহের প্রচলনও ছিল। আসুর বিবাহে মূল্যদান করে কন্যার পাণিগ্রহণ কবা হতো। মানবগৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে বিবাহ মাত্র দুই প্রকার—ব্রাহ্ম ও আসুর।

যদিও মহাভারতীয় যুগে গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ আদর্শ বিবাহ বলে গণ্য হতো, স্মৃতির যুগে এই উভয় প্রকাব বিবাহই অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে এরূপ বিবাহ করলে মানুষকে মহাপাপে লিপ্ত হতে হয়। বৌধায়ন একথাও বলেছেন যে, যদি কোন মেয়েকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে বিনা মন্ত্রপাঠে বিবাহ করা হয় (রাক্ষস বিবাহ), তা হলে তাকে কুমারী কন্যা হিসাবে পুনরায় বিবাহ দেওয়া চলে। পুরাণে এইরূপ বিবাহকে অস্বীকার করা হয়েছে, যদিও মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে যে, বীরপুরুষদের পক্ষে গান্ধর্ব অপেক্ষা রাক্ষস বিবাহ অধিকতর শ্রেয়।

যদিও আসুর বিবাহের প্রচলন নিশ্চয়ই ছিল, তথাপি স্মৃতিকারগণ ক্রমশ এরূপ বিবাহের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। মনু এরূপ বিবাহের অনুমোদন করে এক জায়গায় বলেছেন যে, “কন্যার জন্য পণ বা মূল্য গ্রহণ করা, পিতার স্বাভাবিক অধিকার।” আবার অন্যত্র আসুর বিবাহ সম্পর্কে মনু বিরূপ মত প্রকাশ করেছেন। মনুসংহিতার দুজন প্রধান টীকাকার মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্টও এরূপ বিবাহকে নিকৃষ্ট বিবাহ বলেছেন। অনুরূপভাবে বৌধায়নও এক স্থানে বলেছেন যে, “ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আসুর বিবাহ বৈধ”, আবার অন্যত্র তিনি এর অননুমোদন করেছেন। নারদও এর নিন্দা করে বলেছেন, “বিনাপণে যেখানে স্ত্রী গ্রহণ করা হয়েছে, মাত্র সে ক্ষেত্রেই স্বামী প্রকৃত স্বামী ; অপর পক্ষে যেখানে কন্যাপণ দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের অধিকারিণী স্ত্রী, স্বামী নন্।” যা হউক, স্মৃতিকারগণ কর্তৃক এরূপ বিরূপ মত প্রকাশ করা সত্বেও পরবর্তী-কালে আসুর বিবাহই এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কেন-না, বর্তমানে আসুর বিবাহ হিন্দু সমাজে নিম্ন জাতিসমূহের মধ্যে ও আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে।

এ সম্পর্কে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থিত গ্রীক দেশীয় রাজদূত মেগাস্থিনিস্ তক্ষশিলায় যে প্রথা প্রচলিত থাকতে দেখেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, “যারা দারিদ্র্যের জন্য কন্যাকে সুপাত্রে দিতে পারেন না, তারা যুবতী কন্যাদের হাটে নিয়ে গিয়ে, সেখানে ঢাক ঢোল বাজিয়ে জনতার সমাবেশ করান। যখন জনতার মধ্য থেকে কেহ বিবাহ ইচ্ছুক হয়ে এগিয়ে আসে, তখন কন্যাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে তাকে নিরীক্ষণ করতে দেওয়া হয়। প্রথমে সে কন্যার পশ্চাদ্‌ভাগ নিরীক্ষণ করে, পরে নিরীক্ষণ করে তার সম্মুখভাগ। যদি কন্যাকে তার পছন্দ হয় তা হলে উপযুক্ত পণ দিয়ে সে তাকে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করে।

স্মৃতির যুগে বিবাহ যে কেবল সর্বজনীন ছিল তা নয়, বিবাহ বাধ্যতামূলক-ও ছিল। পুত্র উৎপাদন করে পিতৃপুরুষদের নরক থেকে উদ্ধার করবার জন্য পুরুষদের তো বিবাহ করতেই হতো। যথাসময়ে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থেই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মেয়েদের পক্ষে বিবাহের উপযুক্ত বয়স হচ্ছে দশ, যখন সে "কন্যা" আখ্যা লাভ করে। আরও বলা হয়েছে যে এই বয়সেই কন্যা, নারীর দৈহিক উৎকর্ষতা লাভ করে। পরাশর বিধান দিয়ে বলেছেন যে "যথাসময়ে যদি মেয়ের বিবাহ দেওয়া না হয় তা হলে সেই কন্যার মাসিক রজঃ অপর জগতে তার পিতৃপুরুষদের পান করতে হয় এবং যে তাকে বিবাহ করে, তাকে হতভাগ্য হতে হয়।" তবে বিষ্ণু বলেছেন, "বিবাহের পূর্বে কন্যা যদি পিতৃগৃহে রজস্বলা হয়, তা হলে সে "বৃষলী" (অস্পৃশ্যা) অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু যে তাকে বিবাহ করে তার কোন অপরাধ হয় না।" বশিষ্ঠ, বৌধায়ন, নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য এ সম্পর্কে খুব রেগে গিয়ে বলেছেন, "কুমারী অবস্থায় কন্যা যতবার রজস্বলা হবে, ততবার তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হতে হবে।" গৌতমও এ সম্বন্ধে অন্যান্য স্মৃতিকারগণের সঙ্গে মতৈক্য দেখিয়ে বলেছেন "রজস্বলা হবার আগেই কন্যার বিবাহ দেওয়া চাই।"

ঋতু সঞ্চারের পূর্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধে স্মৃতিকারদের যত্নবান হবার কারণ হচ্ছে কন্যার ঋতুর যাতে সদ্ব্যবহার হয়। বলা হয়েছে, "ঋতু কন্যাকে কলুষমুক্ত করে তাকে বিশোধন করে এবং তাকে গর্ভধারণের উপযুক্ত করে।" এই কারণে স্মৃতিকারগণ বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, ঋতু যেন অব্যবহৃত থাকে, বৃথা নষ্ট না হয়। আরও বলা হয়েছে যে "ঋতুর প্রথম চারদিন ছেড়ে দিয়ে স্বামী যেন নিশ্চয়ই স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন।" "যে ব্যক্তি ঋতুচক্রকালে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন না, তিনি অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করেন।" অনুরূপভাবে বলা হয়েছে, যে স্ত্রী ঋতুকালে তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে

স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয় না, তাকে নরক বাস করতে হয় এবং তার স্বামী ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হন।"

ঋতুকালে স্বামী-স্ত্রীর মিলন সম্বন্ধে স্মৃতিকারগণ বিশেষ জোরের সঙ্গে বিধান দিলেও, ঋতুসঞ্চারের প্রথম চারদিনে মিলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন। বলা হয়েছে যে, ঋতুসঞ্চারের প্রথম চারদিন নারী সঙ্গমের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অনুপযুক্ত থাকে, ঐ সময় স্ত্রীতে উপগত হলে পুরুষকে পাপে লিপ্ত হতে হয় এবং সে ভবিষ্যতে সুখ, শান্তি ও আয়ু থেকে বঞ্চিত হয়। এই পাপকে গুরুতল্প (গুরুপত্নীর সঙ্গে যৌন সংসর্গ) পাপের সহিত তুলনা করা হয়েছে।

স্মৃতিগ্রন্থসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, যেহেতু ঋতু সঞ্চারের প্রথম চারদিন নারী সম্পূর্ণ অশুদ্ধ থাকে, সেইহেতু এই সময় সে অপরের সামনে উপস্থিত হবে না, যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে দূরে থাকবে, তার দ্বারা স্পৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য অপরে গ্রহণ করবে না। যদি ওই সময় কেউ তাকে স্পর্শ করে তবে সে নিজেকে কলুষিত করবে আর ইচ্ছাপূর্বক যদি নারী নিজে কোন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে, তাহলে তাকে প্রকাশ্যে কষাঘাত করা হবে। বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে নারী রজস্বলা হতো না। সেজন্য সঙ্গম সত্ত্বেও নারীর গর্ভ হতো না। পরে যখন কামের জন্ম হয়, তখন সে রজস্বলা হতে সুরু করে এবং সঙ্গমের ফলে গর্ভধারণও করতে থাকে। তার আগে পর্যন্ত মানবসমাজে যোগসাহায্যে সন্তান উৎপাদন করা হতো। মহাভারতের একস্থানে ভীষ্মও বলেছেন "দেবতারা পাঁচ প্রকারে সন্তান উৎপাদন করেন, বাসনা দ্বারা, বাক্য দ্বারা, দর্শন দ্বারা, স্পর্শন দ্বারা ও যৌনসঙ্গম দ্বারা।

যদিও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ ও পুরাণের যুগে জাতিসমূহের মধ্যে সবর্ণ বিবাহই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রকন্যার পাণি-গ্রহণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, যেখানে উচ্চ বর্ণের পুরুষের সঙ্গে হীনবর্ণের মেয়ের বিবাহ হতো, সেরূপ বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলা হতো। আর যেখানে উচ্চ বর্ণের মেয়ের সঙ্গে

হীনবর্ণের পুরুষের বিবাহ হতো, তাকে বলা হতো প্রতিলোম বিবাহ। অনুলোম বিবাহ বৈধ ছিল কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ নিন্দিত ছিল। এরূপ ব্যতিক্রম থাকলেও সবর্ণ বিবাহই সকল জাতির পক্ষে বিধি-সম্মত বিবাহ ছিল।

সবর্ণে বিবাহের বিধি ছাড়া, স্মৃতি ও পুরাণের যুগে বিবাহ নিয়ন্ত্রিত হতে আরম্ভ হয়েছিল গোত্রপ্রবর ও সপিণ্ড দ্বারা। একই গোত্রে বা প্রবরে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। মনে হয়, গোত্রবিধি প্রথম ব্রাহ্মণদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, পরে তা ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু "প্রবর" মাত্র ব্রাহ্মণদেরই ছিল, ক্ষত্রিয়দের ছিল না। ক্ষত্রিয়দের এর বদলে ছিল "কুল"। প্রাচীন ভারতে প্রবর ও কুল এই উভয়েরই বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কেন-না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নিজ প্রবর বা কুল ঘোষণা করতে পারতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করা হতো না। এই কারণেই আমরা মহাভারতেব আদিপর্বে দেখতে পাই যে কর্ণ নিজকুল ঘোষণা করতে না পারায় অর্জুন তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়েছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সত্যকাম জাবালির কাহিনী থেকেও এ প্রকাশ পায়।

"গোত্র" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "গো-বেষ্টনী"। কার্য-ক্ষেত্রে কিন্তু গোত্র বলতে, বংশের পূর্বপুরুষ ঋষির নাম বুঝাতো। মনে হয়, উত্তর ভারতে প্রথমে গোত্রপ্রথা প্রচলিত ছিল না এবং পূর্ব বা দক্ষিণ ভারত থেকে এর প্রবর্তন হয়েছিল উত্তর ভারতে। শাস্ত্রানুসারে দক্ষিণ ভারতের ঋষি বৌধায়নই উত্তর ভারতে এর প্রচলন করেছিলেন। বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে আটজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষির নাম পাওয়া যায়। এই আটজনের নাম যথাক্রমে—ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ (বশিষ্ঠ), কশ্যপ এবং অগস্ত্য। বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণরা সকলেই এই আটজন ঋষির মধ্যে কোন না কোন ঋষির সন্তান। যারা একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, তাদের বলা হয় সগোত্র। সগোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এ থেকে পরিষ্কার

বোঝা যাচ্ছে যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বর্হিবিবাহের একটা সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্যই বৌধায়ন গোত্রপ্রথার প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য আরও অনেক গোত্র-প্রবর্তক ঋষির নাম পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে বঙ্গদেশে যে সকল গোত্র প্রচলিত আছে, সেগুলি যথাক্রমে—অত্রি, অগস্ত্য, অনাবৃকাক্ষ, অব্য, আত্রেয়, আংগিরস, আলম্ব্যায়ণ, কাঞ্চন, কাত্যায়ণ, কান্ব, কান্বায়ণ, কুষিক, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ, গৌতম, গার্গ, জৈমিনি, বশিষ্ঠ, বৈয়াঘ্রপত্ত, বিশ্বামিত্র, বিষ্ণু, বাৎস্য, বৃদ্ধি, ঘৃতকৌশিক, পরাশর, ভরদ্বাজ, মৌদগল্য, জমদগ্নি, রথিতরু, শাণ্ডিল্য, শকৃত্রি, শুনক, সাংকৃতি, সৌপায়ণ, জাতুকর্ণ, ক্ষেত্রি, মৈত্রায়ণি ও ধন্বন্তরি। আগেই বলা হয়েছে যে, গোত্র প্রথমে মাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের, প্রকৃত পক্ষে কোন গোত্র ছিল না। পরবর্তীকালে তাঁরা তাদের কুলপুরোহিতগণের গোত্রসমূহই গ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দুর বিবাহের উপর গোত্রবিধির প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেন-না সগোত্রে বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার। ১৯৪৬ সালে "হিন্দু বিবাহে অযোগ্যতা নিরোধক" আইন বিধিবদ্ধ হবার পূর্ব পর্যন্ত সগোত্রে বিবাহ অবৈধ বলেই বিবেচিত হতো। শাস্ত্রে এরূপ বিবাহকে অজাচার বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

"প্রবর" বলতে প্রাচীন পূর্বপুরুষ ঋষিগণের নামের তালিকা বোঝায়। আসলে এগুলি গোত্রের মধ্যে ছোট ছোট পরিবারের নাম। এগুলি গোত্র-প্রবর্তক ঋষিদের পুত্র-পৌত্রদের নামানুসারে চিহ্নিত। প্রত্যেক প্রবরে এক, দুই, তিন বা পাঁচজন ঋষির নাম দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি গোত্রের সঙ্গে ওই গোত্র সংশ্লিষ্ট প্রবর নামগুলিও কীর্তিত হয়ে থাকে। যদি দুই গোত্রপ্রবরে একই ঋষির নাম থাকে তাহলে গোত্র দুটির অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। এরূপ সমানপ্রবরবিশিষ্ট গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

স্মৃতির যুগে, গোত্রপ্রবর ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে অবাধ বিবাহের আর এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা হচ্ছে সপিণ্ড বিধি। আগেই বলা হয়েছে যে সপিণ্ড বলতে পিতৃকুলে ঊর্দ্ধতম পাঁচপুরুষের জ্ঞাতিবর্গকে বোঝায়। পিতৃকুলের সপিণ্ডগণকে "গোত্রজ সপিণ্ড" ও মাতৃকুলের সপিণ্ডগণকে "ভিন্নগোত্র সপিণ্ড" বা "বন্ধু" বলা হয়। সপিণ্ডদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে উত্তর ভারতে সপিণ্ড বিবাহ নিষেধবিধি যেরূপ কঠোরতার সঙ্গে পালিত হয়, দক্ষিণ ভারতে তা হয় না। তার কারণ, দক্ষিণ ভারতে "বাঞ্ছনীয় বিবাহ"-এর প্রচলন আছে।

ভাই বোন সকলে কি অনুক্রমে বিবাহ করবে! তার-ও একটা নির্দেশ স্মৃতিকাররা দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠা ভগিনী যদি বিবাহ করে, তাহলে তা শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণ হবে। এরূপ বিবাহ হলে বিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যার স্বামী ও পরে বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্বামী, এই উভয়কে জাতি থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হবে এবং তাদের কোন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। বশিষ্ঠ এ সম্পর্কে কৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র, এই দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে কনিষ্ঠার স্বামীকে বারদিন কৃচ্ছ্র সাধন করতে হবে এবং কনিষ্ঠাকে জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামীর হাতে সমর্পণ করতে হবে এবং অনুরূপভাবে জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামীকে কৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র, এই উভয়বিধ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কনিষ্ঠা কন্যার স্বামীর হাতে অর্পণ করতে হবে। তারপর তারা পরস্পর পরস্পরের স্ত্রীকে তাদের প্রকৃত স্বামীর হাতে আবার প্রত্যর্পণ করবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তারা পুনরায় বিবাহিত হবে। পরাশর অবশ্য বলেছেন যে, জ্যেষ্ঠা যদি জন্মাবধি কুব্জা, বামনাকৃতি, দুর্বলচিত্তা, অন্ধ, মুক বা বধির হয়, তা হলে সে ক্ষেত্রে কনিষ্ঠা বিনাদণ্ডে জ্যেষ্ঠার আগেই বিবাহ করতে পারবে।

নরক থেকে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করবার জন্য পুত্র উৎপাদনের

প্রয়োজনীয়তার উপর স্মৃতিকাররা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কারণে বিবাহিত জীবনে যদি সন্তান উৎপন্ন না হয়, কী নিঃসন্তান অবস্থায় যদি কেহ মারা যায়, তা হলে তার স্ত্রী বা বিধবার "ক্ষেত্রে" অপরের দ্বারা সন্তান উৎপাদনের বিধান স্মৃতিকাররা দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থাকে "নিয়োগ" প্রথা বলা হতো। "নিয়োগ" আর কিছুই নয়, স্বামীর পরিবর্ত হিসাবে কোন নিযুক্ত ব্যক্তিকে উৎপাদকরূপে গ্রহণ করা। শাস্ত্র অনুযায়ী মৃতব্যক্তির ভ্রাতা বা কোন নিকট আত্মীয়, বিশেষ করে সপিণ্ড বা সগোত্রকে নিযুক্ত করা হতো। "নিয়োগ" প্রথা অনুযায়ী মাত্র এক বা দুটি সন্তান পর্যন্ত উৎপন্ন করা যেতো, তার অধিক নয়। মনু এবং গৌতম মাত্র দুটি সন্তান উৎপাদনেরই অনুমতি দিয়েছেন। সম্পূর্ণভাবে কামবর্জিত হয়ে এবং অত্যন্ত শুচিপূর্ণ অন্তঃকরণে এই প্রথানুযায়ী সন্তান উৎপাদন করা হতো। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সন্তান প্রজননের সময় উভয়ে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তিকে এমনভাবে উন্নীত করবে যে, পরস্পর পরস্পরকে শ্বশুর ও পুত্রবধূরূপে বিবেচনা করবে। এক কথায়, সন্তান প্রজননের সময় সকল প্রকার কামভাব পরিহারের উপর শাস্ত্রকাররা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ বলেছেন যে, বিধবাকে প্রথম ছয়মাস কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে, তারপর ঋতুকালে তাকে নিযুক্ত ব্যক্তির কাছে যেতে হবে। বৌধায়ন কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য এক বৎসর সময়ের ব্যবস্থা করেছেন। যেহেতু নিজের স্ত্রী নয়, এরূপ স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান উৎপাদিত হচ্ছে, সেইহেতু এরূপ ভাবে উৎপন্ন সন্তানকে "ক্ষেত্রজ" সন্তান বলা হতো। স্মৃতিযুগের শেষের দিকে কিন্তু "নিয়োগ" প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছিল। সেজন্য দেখতে পাওয়া যায় যে, মনু যদিও তাঁর ধর্মশাস্ত্রের এক অংশে এর অনুমোদন করেছেন, অপর অংশে কিন্তু তিনি এই প্রথাকে সম্পূর্ণভাবে গর্হিত বলে ঘোষণা করেছেন। বৃহস্পতিও বলেছেন যে, কলিযুগে "নিয়োগ" প্রথা যথাযথ নয়।

যে অংশে মনু নিয়োগ প্রথার অনুমোদন করেছেন, সেখানে তিনি একথা পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন, যে স্ত্রীলোকের কোন সন্তান হয় নি, মাত্র সেই স্ত্রীলোকই "নিয়োগ" প্রথা অবলম্বনের প্রকৃত অধিকারিণী। একথাও তিনি বলেছেন যে, নিঃসন্তান হলে স্বামীর জীবদ্দশাতেই স্বামী কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে স্ত্রী "নিয়োগ" প্রথানুযায়ী সন্তান উৎপাদনের জন্য অপর পুরুষকে আহ্বান করতে পারেন। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এই উদ্দেশ্যে মাত্র কোন আত্মীয়কেই আহ্বান করা যেতো, অপরকে নয়। স্বামীর জীবদ্দশাতেই নিয়োগ-প্রথা অবলম্বনের অধিকার, স্ত্রীকে অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থ ও পুরাণেও দেওয়া হয়েছে। মহাভারতেও উক্ত হয়েছে যে, পাণ্ডু এই অধিকার কুন্তীকে দিয়েছিলেন।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, "সন্তান প্রজননের জন্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অপরের হস্তে সমর্পণ করা কলিযুগে নিষিদ্ধ হয়েছে। কলিযুগে এরূপ যৌনমিলন ব্যভিচাররূপে গণ্য হয় এবং এরজন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।" এই উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, পূর্ববর্তীকালের সমাজে "নিয়োগ" প্রথা অনুমোদিত হলেও, পরবর্তীকালের সমাজে এ প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছিল। নিয়োগ প্রথার পিছনে যে যুক্তি ছিল তা হচ্ছে, "যেহেতু স্ত্রী স্বামীর পুত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রস্বরূপ, সেইহেতু ক্ষেত্রের মালিক হিসাবে তার অধিকার আছে ওই ক্ষেত্র নিজে বা অপরকে দিয়ে কর্ষিত করবার।" যাহোক, শাস্ত্রকারদের পরস্পর বিরোধী বিধানসমূহ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রাক্তনকালের প্রথা পরবর্তীকালে অবৈধ এবং গর্হিত বলে ঘোষিত হয়েছিল। বস্তুতঃ একথা অনেক জায়গায় বলা হয়েছে যে, প্রাচীনকালে দেবতা ও ঋষিদের পক্ষে যা বৈধ এবং প্রশস্ত ছিল, পরবর্তীকালের মানুষের পক্ষে তা গর্হিত ও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

"নিয়োগ" প্রথানুযায়ী প্রসূত সন্তানের পিতৃত্ব সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য

বলেছেন, "কোন অপুত্রক ব্যক্তি যদি অপর কোন অপুত্রক ব্যক্তির "ক্ষেত্রে" সন্তান উৎপাদন করে তাহলে উভয় অপুত্রক ব্যক্তিই সেই সন্তানের পিতা বলে গণ্য হবে এবং সেই সন্তান উভয় ব্যক্তিরই শ্রাদ্ধ সম্পাদনের অধিকারী হবে।" পরাশর বলেছেন, "ক্ষেত্রের অধিকারীর (স্বামীর) অনুমতি পেয়ে কেহ যদি অধিকারীর 'ক্ষেত্রে' বীজ বপন করে, তাহলে সেই উৎপন্ন ফলের অধিকারী উভয়েই, 'ক্ষেত্র' অধিকারী ও 'বীজ' অধিকারী। তবে বীজ অধিকারী যদি ক্ষেত্র অধিকারীর গৃহে গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে বীজ অধিকারী সন্তানের মালিক নয়। শাস্ত্রকাররা এইরূপ মিলনকে ব্যভিচার বলে গণ্য করেছেন। আর স্ত্রী যদি বীজ অধিকারীর গৃহে তার সঙ্গে মিলিত হয়, তবেই বীজ অধিকারী সেই উৎপন্ন সন্তানের অধিকারী হয়।" কৌটিল্যও বলেছেন যে, স্ত্রী যদি স্বামী গৃহেই অপরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করান, তাহলে স্বামীই উৎপন্ন সন্তানের মালিক। বীজ অধিকারীর সন্তানের উপর অধিকার, মাত্র তখনই অর্সায় যখন স্ত্রী বীজ অধিকারীর গৃহে গিয়ে সন্তান উৎপাদন করান।

নারীর পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে স্মৃতিকাররা কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক কথা বলেছেন। এ সম্বন্ধে সাধারণ বিধি ছিল এই যে, কন্যাকে মাত্র একবারই সম্প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, "অধিকতর গুণবিশিষ্ট পাত্র পাওয়া গেলে দত্তা কন্যাকে আবার দ্বিতীয় বার দান করা যেতে পারে।" নারদও বলেছেন, "অনূঢ়া কন্যাকে দান করবার জন্য যদি একবার মূল্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং পরে যদি অধিকতর গুণবিশিষ্ট পাত্র পাওয়া যায় তাহলে পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যেতে পারে।" নারদ আরও বলেছেন, "কন্যাকে মাত্র একবারই দান করা চলে"—এই বিধি মাত্র ব্রাহ্ম, আর্শ, দৈব, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ববিবাহের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত, অন্য ক্ষেত্রে এটা পাত্রের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। মনু বলেছেন, "যদি

বিবাহ অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই পাত্র মারা যায়, তাহলে কন্যাকে পাত্রের ভ্রাতার হস্তে দান করা যেতে পারে।” তবে বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন উভয়েই বলেছেন, “যে ক্ষেত্রে কন্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহে দান করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া চলে।” এ-কথারই প্রতিধ্বনি করে মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, শিবের বিধান অনুযায়ী কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া চলে। অত্যয় অবস্থাতেও নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ স্মৃতিকাররা অনুমোদন করেছেন। স্বামী যদি বিদেশ ভ্রমণে যান এবং শাস্ত্র-নির্দিষ্টকালের মধ্যে প্রত্যাগমন না করেন, তাহলে স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে। নির্দিষ্ট কি সময় উত্তীর্ণ হলে স্ত্রী আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে, সে সম্বন্ধে নারদ বলেছেন,“সন্তানবতী ব্রাহ্মণবর্ণের নারীকে আট বৎসর অপেক্ষা করতে হবে আর সন্তানহীনা নারীকে চার বৎসর। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়া নারীকে যথাক্রমে ছয় বৎসর ও তিন বৎসর, বৈশ্যা নারীকে চার বৎসর ও দুই বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। শূদ্রা নারীর পক্ষে কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, যে কোন সময় সে পুনরায় বিবাহ করতে পারে।” বশিষ্ঠ বলেন যে, এরূপ বিবাহ নিজবংশেরই অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে হওয়া চাই। বশিষ্ঠ এ সম্পর্কে যে সময় অতিবাহনের নির্দেশ দিয়েছেন, তা হচ্ছে ব্রাহ্মণীর পক্ষে সাড়ে পাঁচ ও চার বৎসর, ক্ষত্রিয়ার পক্ষে পাঁচ ও তিন বৎসর, বৈশ্যার পক্ষে চার ও দুই বৎসর এবং শূদ্রার পক্ষে তিন ও এক বৎসর। মনু এ সম্বন্ধে জাতিনির্বিশেষে বিধান দিয়েছেন যে, স্বামী যদি তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে বিদেশে যান, তাহলে স্ত্রীকে আট বৎসর অপেক্ষা করতে হবে আর যদি যশার্জনের জন্য যান তাহলে ছয় বৎসর এবং যদি মৃগয়া বা প্রমোদের জন্য যান তাহলে তিন বৎসর অপেক্ষা করতে হবে।

সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণে একথা অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, স্বামী যদি মৃত কী নিরুদ্দিষ্ট হন, কী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন,

কী নপুংসক প্রতিপন্ন হন, কী সমাজে পতিত হন, তাহলে এই পাঁচ প্রকার অত্যয়কালে স্ত্রী পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারেন। আরও বলা হয়েছে যে, কোন নিষ্কলঙ্কা কন্যা যদি ভুলক্রমে কোন চির-ব্যাধিগ্রস্ত, কী কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত, কী বিকলাঙ্গ, কী গৃহহীন, কী জাতিভ্রষ্ট বা জ্ঞাতিকুটুম্ব পরিত্যক্ত, কী দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হয়, তবে সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে পুনরায় বিবাহ করতে পারে।

উত্তরকালের হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে বিবাহিতা নারীর পুনরায় বিবাহ অবশ্য সহনীয় রীতি ছিল না। এমন কি স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হলেও নারীকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করে, সধবা স্ত্রীলোকের সমস্ত চিহ্ন পরিহার করে বিধবার ভূষণ গ্রহণ করে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হতো। মনে হয় যে, উত্তরকালে নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে যে নূতন ধ্যান গৃহীত হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় এই পরিবর্তন ঘটেছিল।

"নিয়োগ" প্রথানুযায়ী অপর পুরুষের দ্বারা গর্ভসঞ্চারণ করানোর রীতি যখন বিলুপ্ত হলো, তখন নারীর সতীত্ব সম্পর্কে হিন্দুসমাজে এক নূতন ধারণা কল্পিত হলো। চরিত্রবতী সতী নারী পতিব্রতারূপে পরিগণিত হলো। পতিব্রতা নারী বলতে বুঝালো সেই স্ত্রীকে যে মনেপ্রাণে স্বামীর প্রতি অনুরক্তা এবং শয়নে-স্বপনে ও সকল কর্মে স্বামীর অনুবর্তিনী। স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিত যৌনসংস্রব ব্যভিচার বলে পরিগণিত হলো। নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন নারীর সহিত যৌনসংস্রব পুরুষের পক্ষেও নিষিদ্ধ হলো। মনু নূতন সামাজিক চিন্তার স্রষ্টা হয়ে দাঁড়ালেন। মনু বিধান দিলেন, "পর-দার গমনের তূল্য পাপ ইহজগতে এমন কিছু নেই যা মানুষকে স্বল্পায়ু করে তোলে। স্ত্রীলোকের গাত্রে যত লোমকূপ বা রন্ধ্র আছে, পরদারগামী পুরুষকে তত বৎসর নরকে বাস করতে হয়।" পরদার গমন অপরাধের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণসমূহে অতি কঠোর শাস্তি

ব্যবস্থিত হলো। বৌধায়ন ও মনু উভয়েই ব্যভিচারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করলেন। আপস্তম্ভ বললেন যে, ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ কর্তন করে শাস্তি দেওয়া হবে এবং যদি সে কোন অনূঢ়া কন্যার সঙ্গে ব্যভিচার করে থাকে তাহলে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হবে। আরও বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্টা নারী বা কুমারীকে রাজা সমস্ত কলঙ্ক থেকে মুক্ত করবেন এবং তার অভিভাবকদের হাতে তাকে প্রত্যর্পণ করবেন, যদি অভিভাবক তার দ্বারা যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত নিষ্পাদনের ব্যবস্থা করেন। ব্যভিচারীর শাস্তিস্বরূপ নারদ যে দণ্ড বিধান করেছেন তা হচ্ছে, ১০০ পণ অর্থদণ্ড, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, পুরুষাঙ্গছেদন ও মৃত্যু। মোটকথা, সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থেই ব্যভিচার অপরাধের জন্য নানারূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে অপরের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখে এবং রোষান্বিত হয়ে উভয়কেই হত্যা করে, তবে তার জন্য সে কোন দণ্ড পাবে না।

একথা এখানে বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে স্মৃতিশাস্ত্র সমূহের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যভিচার মাত্র যৌনসঙ্গমের দ্বারাই সংঘটিত হতো না। কেননা শাস্ত্রানুযায়ী মৈথুন আট প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি দ্বারা। শাস্ত্রকাররা বলেছেন যে, যদি কাহাকেও অপরের স্ত্রীর সঙ্গে নদীর সঙ্গমস্থলে, কী স্নানের ঘাটে, কী উদ্যানে, কী অরণ্যে বাক্যালাপ করতে দেখা যায় বা তার সঙ্গে বিহার করতে দেখা যায় বা তাকে চুম্বন করতে দেখা যায় বা তার প্রতি চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করতে বা হাস্য করতে দেখা যায় বা তার বস্ত্র বা আভরণ অনুচিতস্থানে স্পর্শ করতে দেখা যায় বা তার সঙ্গে একই শয্যায় উপবিষ্ট থাকতে দেখা যায় বা তার হস্ত, কেশ বা বস্ত্রপ্রান্ত ধরতে দেখা যায়, তাহলে সে

ব্যক্তি ব্যভিচার অপরাধে লিপ্ত বলে গণ্য হবে। নারদ একথাও বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে গর্বসহকারে বলে যে, সে অমুক স্ত্রীলোককে সম্ভোগ করেছে, তাহলে শাস্ত্রানুযায়ী সেও ব্যভিচার দোষে লিপ্ত।

যতপ্রকার ব্যভিচার আছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও কদর্য বলে শাস্ত্রে নিন্দিত হয়েছে, গুরুতল্প বা গুরুস্ত্রীগমন। গুরুস্ত্রীর সঙ্গে যৌনসংস্রবের জন্য শাস্ত্রে অতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনু বলেছেন, যে ব্যক্তি গুরুতল্প অপরাধে অভিযুক্ত, তাকে জ্বলন্ত লৌহকটাহের উপর উপবিষ্ট করাতে হবে, তার পুরুষাঙ্গ কর্তন করতে হবে এবং তার তুই চক্ষু উৎপাটিত করতে হবে।

সতীত্ব সম্পর্কে নূতন ধারণার উদ্ভবের সঙ্গে বিধবার পক্ষে নিষ্কাম, নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র জীবনযাপন করবার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হলো। পরাশর বললেন যে, বিধবা নিষ্কাম ও সতীত্বপূর্ণ জীবনযাপন করলে তার উচ্চতম স্বর্গে স্থান হবে। পরাশর আরও বললেন যে, বিধবা যদি বৈধব্য অবস্থায় গর্ভবতী হয়, তাহলে তাকে দেশ থেকে বহির্ভূত করে দেওয়া হবে।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, স্মৃতিপুরাণ যুগের যৌনজীবনের ডামাডোলের ভেতর দিয়ে একটা সুস্থিত আদর্শের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। বিভিন্ন স্মৃতিকারদের পরস্পর-বিরোধী বিধানসমূহের মধ্যে একটা সমন্বয় আনবার চেষ্টা করেছিলেন মনু। পরবর্তীকালে মনুর বিধানই প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাঁর বিধানের ভিত্তিতে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেই আদর্শ রচিত হয়েছিল নিম্নলিখিত বিধিগুলি নিয়ে—

১। বিবাহ নিষ্পন্ন হবে মাত্র মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞ সম্পাদন ও সপ্তপদী-গমনদ্বারা।

২। জাতি নির্বিশেষে সকলকেই পুত্র উৎপাদনের জন্য বিবাহ অবশ্যই করতে হবে।

৩। কন্যার বিবাহ দিতে হবে সে ঋতুমতী হবার পূর্বে।

৪। বিবাহ সংঘটিত হবে মাত্র জাতির মধ্যে।

৫। বিবাহ সগোত্রে, সপ্রবরে ও সপিণ্ডের মধ্যে হতে পারবে না।

৬। বিবাহিতা নারীকে সতীত্বের সমস্ত বিধান অনুসরণ করে পতিব্রতা হয়ে থাকতে হবে।

৭। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাকে সধবার সমস্ত ভূষণ পরিহার করে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

৮। পরস্ত্রীগমন ব্যভিচাব বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য ব্যভিচারীকে গুরুদণ্ড পেতে হবে।

বলাবাহুল্য, উত্তরকালের নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজের যৌনজীবন এই সকল বিধির উপব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

॥ চার ॥

জ্ঞাতিত্ব ও স্বজন বিবাহ

আমরা আগের অধ্যায়েই দেখেছি যে প্রাচীন ভারতে নানারকম বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত মাত্র একরকম বিবাহই আদর্শ বিবাহ হিসাবে নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজে গৃহীত হয়েছিল। এই বিবাহ নিষ্পন্ন হতো মন্ত্র উচ্চারণ, হোমাদি যজ্ঞ কর্ম সম্পাদন ও সপ্তপদীগমন দ্বারা। উত্তরকালে হিন্দুসমাজে এরূপ বিবাহই একমাত্র বৈধবিবাহরূপে গণ্য হয়েছিল। আমরা আরও দেখেছি যে, এরূপ বিবাহে কতকগুলি জ্ঞাতিত্বমূলক বিধি পালন করা হতো।

ভারতের জ্ঞাতিত্বমূলক সংগঠন দ্বিপার্শ্বিক। পিতা এবং মাতা, এই উভয়েরই কুল বা বংশ অবলম্বন করে জ্ঞাতিসমূহ নির্ধারিত হয়। এই উভয়কুলেই ঊর্ধ্বতন প্রত্যেক জ্ঞাতিরই ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা আছে। তবে বিবাহ সম্পর্কে এই সকল জ্ঞাতিবর্গের পদমর্যাদা ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের। উত্তর ভারতে পিতৃকুলের ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষের এবং মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন পাঁচপুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধবিধিকে সপিণ্ডবিধি বলা হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ও পশ্চিম ভারতে অনেক স্থানে সপিণ্ডবিধির শ্লথতা দেখা যায়। এ সকল জায়গায় মামাতো বোন ও পিসতুতো বোন বাঞ্ছনীয় পাত্রী হিসাবে পরিগণিত হয়। দক্ষিণ ভারতে তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে মামার সঙ্গে ভাগ্নীর বিবাহও প্রচলিত আছে। সুতরাং বিবাহ সম্পর্কে সপিণ্ড বিধি দক্ষিণ ভারতে পূর্ণভাবে পালিত হয় না। তবে সহোদরা বা পিতৃকন্যার সঙ্গে বিবাহ হিন্দুসমাজে কোন জায়গাতেই হয় না।

বাঞ্ছনীয় বিবাহ যে মাত্র মাতুলকন্যা বা পিতৃষ্বসার কন্যার মধ্যেই নিবদ্ধ, তা নয়। অপর শ্রেণীর জ্ঞাতিদের সঙ্গেও কোথাও কোথাও বিবাহের প্রচলন আছে। দেবরণ বা দেবর কর্তৃক বিধবা ভাবীকে বিবাহ এর অন্যতম। বর্তমানে এরূপ বিবাহ যদিও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তবুও কালান্তরে যে এরূপ বিবাহ ভারতে ব্যাপক ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে দেবরণ মাত্র উত্তর ভারতের কতিপয় জাতির মধ্যে ও বাংলা-ওড়িষ্যার নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। 'বর্তমানে যে ক্ষেত্রে দেবরণ প্রথা প্রচলিত আছে, সে ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তার বিধবা বিনা অনুষ্ঠানে দেবরের গৃহে গিয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার সহিত সপত্নীরূপে বসবাস করতে সুরু করে। উত্তর ভারতে এরূপ রীতির নাম হচ্ছে "ঘর বঠেলি।" তবে একথা বলা উচিত যে, উত্তর ভারতে বহুজাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত থাকলেও উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে এব কোন চলন নেই। ১৯২৯ সালে "ম্যান ইন ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বর্তমান লেখক দেখিয়েছিলেন যে, বাঙালী সমাজে জ্ঞাতিত্বমূলক এমন অনেক আচার ব্যবহার আছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বাঙ্গালী সমাজেও এক সময় দেবরণ ও শ্যালিকাবরণ প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে এরূপ রীতি প্রচলিত না থাকলেও বাউরি, বাগদি ও সাঁওতাল সমাজে এর প্রচলন আছে। ওড়িষ্যার নিম্ন শ্রেণীর জাতিসমূহও এই প্রথা অনুসরণ করে।

ভারতের কোন কোন জায়গায় এখনও বহুপতি গ্রহণ প্রথার প্রচলন আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীর সহোদর ভ্রাতারাই অন্যান্য স্বামী হিসাবে কার্যকর থাকে। যে সমাজে ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিত্ব প্রচলিত আছে সে সমাজে একই স্ত্রীর উপর সকল ভ্রাতারই সমান যৌন অধিকার বিদ্যমান থাকে। যদিও বহুপতিত্ব আজ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মাত্র কয়েকটি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তথাপি এরূপ

চিন্তা করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে এক সময় এর আরও ব্যাপকতা ছিল।

দুটি বিশেষ ধরনের জ্ঞাতিত্বমূলক বিবাহ উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে। আসামের গারো জাতির লোকেরা বিধবা শ্বাশুড়ীকে বিবাহ করে এবং লাখের, বাগনি ও ডাফলা জাতির লোকেরা বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করে।

॥ পাঁচ ॥

হিন্দুসমাজে বিবাহ

হিন্দুকে যে বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে বিবাহ করতে হবে, সেটা স্থির হয়ে যায় তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। কেননা হিন্দুসমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক হিন্দুকে তার নিজ জাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। এক কথায়, হিন্দুসমাজব্যবস্থায় জাতিই হচ্ছে অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠীস্বরূপ। তবে, নিজ জাতির মধ্যে যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীলোককে অবাধে বিবাহ করতে পারে না। জাতিসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত এবং এই শাখা-উপশাখাগুলি আবার বিবাহের গণ্ডী নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণগণ আটটি শাখায় বিভক্ত। পঞ্চগৌড়, পঞ্চদ্রবিড় সারস্বত, পুষ্করণ, শ্রীমালী, ছন্যতি, শাকদ্বীপী ও উদীচ্য। এগুলি প্রত্যেকেই অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে। তার মানে, এক শাখার স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ অন্য শাখাব স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আবার বিবাহের গোষ্ঠীগুলিকে আরও সংকীর্ণ করা হয়েছে শাখাগুলিকে উপশাখায় বিভক্ত করে। যেমন, উত্তব ভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছন্যতি শাখা ছয়টি উপশাখায় বিভক্ত। যথা, সারস্বত, গুর্জরগড়, খাণ্ডেলবাল, দধীচ, শিকওয়াল ও পারিখ। এর প্রত্যেকটিই অন্তর্বিবাহকারী উপদল। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক। বৈদিকরা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য। এ ছাড়া বাংলাদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণও আছে। এগুলি সবই অন্তর্বিবাহকারী গোষ্ঠী। বাংলাদেশের কায়স্থদের মধ্যেও তিন শ্রেণী আছে, রাঢ়ী,

বারেন্দ্র ও বঙ্গজ। রাঢ়ীরা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী। সদ্‌গোপদের মধ্যেও অনুরূপভাবে দুই বিভাগ আছে। পূর্বকুল ও পশ্চিমকুল। বলাবাহুল্য কিছুকাল আগে পর্যন্ত উপরোক্ত শ্রেণীসমূহ সবই অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে কার্যকর ছিল। তার মানে এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর কোন বৈবাহিক আদান-প্রদান ঘটতো না। তবে বর্তমানে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাবে এ সকল নিষেধমূলক বাধা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহের মধ্যেও নানা শাখা-উপশাখা পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, বাগদীরা নয়টি শাখায় বিভক্ত। এই শাখাগুলি হচ্ছে তেঁতুলিয়া, কাসাইকুলিয়া, ডুলিয়া, ওঝা, মেছুয়া, গুলি মাঝি, দণ্ড মাঝি, কুসমেতিয়া ও মল্লমেতিয়া (মাতিয়া বা মাতিয়ালা)। এই শাখাগুলি সবই অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে কার্য করে। প্রতি শাখার মধ্যে অনেকগুলি করে উপশাখা আছে। সেগুলি বহির্বিবাহের গোষ্ঠী। বাউরিদের মধ্যেও নয়টি শাখা আছে। যেমন, মল্লভুমিয়া, শিখরিয়া বা গোবরিয়া, পঞ্চকোটি, মোলা বা মুলা, ধুলিয়া বা ধুলো, মলুয়া, ঝাটিয়া বা ঝেটিয়া, কাঠুরিয়া ও পাথুরিয়া। তবে বাগদীদের সঙ্গে বাউরিদের প্রভেদ এই যে, বাউরিদের মধ্যে এই সকল শাখা অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ এই উভয় হিসাবেই কার্যকর। তাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

বিবাহ সম্পর্কে দক্ষিণ ভারতেও শ্রেণীগত অনেক বাধা আছে। তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণরা ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত। আয়াররা শৈবভক্ত ও আয়াঙ্গাররা বিষ্ণুভক্ত। এর প্রত্যেকটি সেখানে অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে। আবার কোন কোন জায়গায় এই উভয় শ্রেণীর তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহে আঞ্চলিক বাধাও আছে। এই সকল আঞ্চলিক বাধার মূল ভিত্তি হচ্ছে, স্ত্রী-পুরুষকে নিজ নিজ অঞ্চলে বা গ্রামে বিবাহ করতে হবে। যদিও

বর্তমানে এই বিধি অনেক পরিমাণে শ্লথ হয়েছে, তথাপি দুই তিন পুরুষ আগে পর্যন্ত এ বিবাহ বিশেষ কঠোরতার সঙ্গে পালিত হতো।

কিন্তু হিন্দুসমাজে অবাধ বিবাহের আরও প্রতিবন্ধকতা আছে। উপরে যে অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠীগুলির কথা বলা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অবাধ বিবাহ নিয়মিত হয় গোত্রপ্রবর ও সপিণ্ডবিধি দ্বারা। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ কখনও সগোত্রে বা সমপ্রবরে হয় না। আবার সপিণ্ডের সহিতও বিবাহ নিষিদ্ধ। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন অংশে আরও অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে গাঁঞী, পর্যায়, শাখা, বেদ ও মাতা। তবে সপিণ্ডবিধিই হচ্ছে প্রধানতম অন্তরায়। এ সকল বাধা নিষেধের ফলে বিবাহের গণ্ডী এমনভাবে সংকীর্ণ হয়েছে যে, এ সম্পর্কে গণনা করে দেখা গিয়েছে যে উত্তর ভারতে মাত্র সপিণ্ডবিধির নিষেধ মানতে গেলে ২,১২১টি আত্মীয়কে বিবাহের জন্য পরিহার করতে হয়। এ কারণে সপিণ্ড-বিধিকে এখন তিনপুরুষের মধ্যে নিবদ্ধ করা হয়েছে। আবার যেখানে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত আছে সেখানে বিবাহের গণ্ডী মেল বন্ধন, থাক ও পটটি বন্ধন দ্বারা আরও সীমিত হয়ে গেছে।

দক্ষিণ ভারতে বাঞ্ছনীয় বিবাহ প্রচলিত থাকার দরুন, সপিণ্ড-বিধি অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে গেছে। বাঞ্ছনীয় বিবাহ সাধারণতঃ মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বা মামাতো বোন কিংবা পিসতুতো বোনের সঙ্গে হয়। তবে যেখানে মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে সেখানে এরূপ বিবাহ সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিধি-নিষেধ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বিবাহ মাত্র বড় বোনের মেয়ের সঙ্গেই হয়, ছোট বোনের মেয়ের সঙ্গে হয় না। মারাঠাদেশে এরূপ বিবাহ মাত্র পিতৃকেন্দ্রিক জাতিসমূহের মধ্যেই দেখা যায়, মাতৃকেন্দ্রিক জাতি-সমূহের মধ্যে এটা নিষিদ্ধ।

ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ মাত্র পিসতুতো বোন বা মামাতো বোনের সঙ্গেই হয়। তার মানে, এক ক্ষেত্রে বিবাহ হয় মামাতো

ভাইয়ের সঙ্গে আর অপর ক্ষেত্রে বিবাহ হয় মামাতো বোনের সঙ্গে। মাসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহ যদিও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ তথাপি এর প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় অন্ধ্রপ্রদেশের কোমতি ও কুরুব জাতিদ্বয়ের মধ্যে। কর্ণাটকের কোন কোন জাতির মধ্যেও এর প্রচলন আছে। কর্ণাটক দেশে দশস্থ ব্রাহ্মণরাও ভাগ্নী ও মামাতো বোনকে বিবাহ করে।

যদিও উত্তর ভারতে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ সাধারণভাবে প্রচলিত নেই তথাপি অনুমান করা যেতে পারে যে এক সময় এর ব্যাপকতা ছিল। আমরা আগেই বলেছি যে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এর বহু উল্লেখ আছে। বর্তমানে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, কাথিয়াবার, মহারাষ্ট্র ও ওড়িষ্যার কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। রাজপুতদের মধ্যে মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ বাধ্যতামূলক না হলেও এরূপ বিবাহ প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। রাজস্থান, কাথিয়াবাব ও গুজরাটের রাজন্যবর্গের মধ্যে এরূপ বিবাহের অনেক নিদর্শন আছে। যোধপুরের রাজপরিবারে পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহের দৃষ্টান্তও আছে, মামাতো বোনের সঙ্গে নেই। তার মানে, মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ এক্ষেত্রে অনুমোদিত নয়। কিন্তু কাথি, আহির ও গাধব চারণদের মধ্যে মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহের কোন বাধা নেই! মহারাষ্ট্রের কুনবীদের মধ্যে কোন কোন শাখা ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ অনুমোদন করে কিন্তু অপর কতিপয় শাখা তা করে না। মধ্যমহারাষ্ট্রের মারাঠাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক মাত্র মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ অনুমোদন করে কিন্তু ওর দক্ষিণে অবস্থিত লোকেরা মামাতো ও পিসতুতো উভয় শ্রেণীর বোনের সঙ্গেই বিবাহ মঞ্জুর করে।

উত্তর প্রদেশের টেরি গাড়ওয়ালের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহের একটা বৈচিত্র্য আছে। টেরি গাড়ওয়ালের ব্রাহ্মণরা দুটি শাখায়

বিভক্ত—বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও মিশ্র ব্রাহ্মণ। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণরা আর্যত্ব দাবী কবে আর মিশ্র ব্রাহ্মণরা উদ্ভূত হয়েছে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও খস্ জাতির সংমিশ্রণে। এই কারণে মিশ্র ব্রাহ্মণদের খস্ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হয়। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবা তুই উপশাখায় বিভক্ত—সরোলা ও যারা সরোলা নয়। শ্রেণী হিসাবে সরোলা সম্প্রদায় অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী। কিন্তু সম্প্রদায় হিসাবে এরা এত ক্ষুদ্র যে বিবাহের জন্য এদের পাত্রী সংগ্রহ করা খুব মুশকিল হয়। এই কারণে সরোলা ব্রাহ্মণরা প্রায়ই খস্ জাতির মেয়ে বিবাহ করে। এছাড়া সবোলা ব্রাহ্মণরা অনেক সময় বাধ্য হয় যারা সরোলা নয় তাদের মেয়েকে বিয়ে কবতে। এখানে মজাব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এরূপ বিবাহের পর সবোলা ব্রাহ্মণের মর্যাদাচ্যুতি ঘটে না কিন্তু এই বিবাহেব ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হয় সে তার পিতার মর্য্যাদা পায় না। তাকে বলা হয় গাঙ্গেরি।

এত সব বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের বিধান ছিল যে, বিবাহ সকলকে করতেই হবে। কেননা বিবাহ না করলে পুত্র আসবে কোথা থেকে, যে পুত্র পূর্বপুরুষদের স্বর্গে যাবার পথ পরিষ্কার করে দেবে। এই কারণে, হিন্দুসমাজে বিবাহ ছিল বাধ্যতামূলক। বিবাহ ব্যাপারে হিন্দুসমাজে সকলেরই যোগ্যতা আছে। তা সে কানা, খোঁড়া, পঙ্গু বা আর যা কিছুই হোক না কেন। বিবাহের যোগ্যতা সম্পর্কে হিন্দুসমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গী, আধুনিককালের আদালত কর্তৃকও সমর্থিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, যার যত খুশী, বিবাহ করতে পারতো। বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণরা তো বস্তা বেঁধে বিবাহ করতেন! এরূপ শোনা যায় যে, এক একজন ২০০।৩০০ পর্যন্ত বিবাহ করতেন। আজকের দিনে হিন্দু অবশ্য তার এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালের হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে এক স্ত্রী জীবিত থাকতে পুনরায় বিবাহ করা অপরাধ। আবার আর্থিক কারণে আজকাল

তো অনেকে বিবাহই করছেন না। সারাজীবনই আইবুড়ো থেকে যাচ্ছেন।

মোটকথা, কিছুকাল আগে পর্যন্ত হিন্দুসমাজে বিবাহ ছিল সর্বজনীন ব্যাপার। এটা ছিল একটা ধর্মীয় সংস্কার এবং সকল হিন্দুকেই ওই সংস্কার অবশ্য পালন করতে হতো। তবে হিন্দু-সমাজে বিবাহ নিজেদের স্ব স্ব নির্বাচনের উপর নির্ভর করতো না। পিতা-মাতা বা অভিভাবকরাই বিবাহ স্থির করতেন। এখনও অবশ্য এই নিয়মই বলবৎ আছে। তবে উদারপন্থী বাপ-মা আজকাল অনেক ক্ষেত্রে ছেলেকে স্বাধীনতা দিচ্ছেন আগে থাকতে মেয়েকে দেখে এসে পছন্দ করবার।

আজকালকার দিনে অনেক ক্ষেত্রে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন মারফত পাত্র ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু আগেকার দিনে মধ্যস্থতা করবার জন্য ঘটকের সাহায্য নেওয়া হতো। বৈদিকযুগে এদের দিবিস্থ বা শম্ভাল বলা হতো। পরবর্তী-কালে তাঁরা ঘটক নামে পরিচিত হয়েছিল। এর জন্য ঘটকদের প্রতি পরিবারের কুলপঞ্জী রাখতে হতো। কুলপঞ্জীগুলোয় থাকতো পাত্র-পাত্রী ও তাদের পূর্বপুরুষদের বংশতালিকা। কুলপঞ্জীর বিশেষ করে প্রয়োজন হতো, বিবাহে নিষিদ্ধ সপিণ্ড পরিহার করবার জন্য।

ঘটকরা সাধারণতঃ কোন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে পাত্রের পিতা কিংবা কোন জ্যেষ্ঠ আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হতেন। যদি পাত্রপক্ষ প্রস্তাবিত সম্বন্ধ মঞ্জুর করতেন তা হলে যোটকবিচারের জন্য পাত্রীর ঠিকুজি চেয়ে পাঠানো হতো।

হিন্দুসমাজে মাত্র জাতি, শাখা, গোত্র প্রবর ও সপিণ্ডই যে অবাধ বিবাহের অন্তরায় হিসাবে কাজ করতো, তা নয়। এ সম্পর্কে জ্যোতিষের প্রভাবও কম ছিল না। হিন্দু কর্মবাদী, সে অদৃষ্টে বিশ্বাস রাখে এবং সেই কারণে জ্যোতিষের উপরও তার আস্থা খুব কম ছিল না। বিবাহ সম্পর্কে যোটকবিচারই জ্যোতিষের প্রধান অঙ্গ। বর

ও কন্যার জন্মরাশি থেকে যে শুভাশুভ বিচার করা হয় তাকে যোটক-বিচার বলা হয়। যোটকবিচার আট রকমের। বর্ণকুট, বশ্যকুট, তারাকুট, যোনিকুট, গণকুট, গ্রহমৈত্রীকুট, রাশিকুট ও ত্রিনাড়ীকুট। প্রতি কুটের গুণানুযায়ী তার মূল্যায়ন করা হয় এক একটি সংখ্যা দিয়ে। নাড়ীকুটের ৮, রাশিকুটের ৭, গণমৈত্রীকুটের ৬, যোনিকুটের ৪, তারাকুটের ৩, বশ্যকুটের ২, বর্ণ ও কুটের ১, মোট ৩৬ গুণ। সবরকম কুটের সমষ্টি অর্ধেকের বেশী হলে গুণাধিক্যহেতু বিবাহে মিলন শুভ হয় নতুবা অশুভতাহেতু সে পাত্রী পরিত্যক্তা হয়।

বিবাহের জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন মাস ব্যবস্থিত আছে। বঙ্গদেশে বিবাহের জন্য বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাস প্রশস্ত। বিবাহ পঞ্জিকার সব বৎসরেই হয়। কেবল গুজরাটে বিবাহ সব বৎসরে হয় না। সেখানে মাত্র বিশেষ বৎসরে বিবাহ হয় এবং এই বিশেষ বৎসর বহু বৎসরের ব্যবধানে আসে। সেই কারণে ওইরূপ সময় গুজরাটে বিবাহের মরসুম লেগে যায়। তখন সকলেই বয়স নির্বিশেষে ছেলেমেয়ের বিবাহ দেবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। এমন কি, পাছে গর্ভস্থ পুত্রকন্যার বিবাহ পরে ফসকে যায় সেই কারণে গর্ভবতী মেয়েরাও গর্ভস্থ পুত্রকন্যার পক্ষ হয়ে নিজেরাই বিবাহের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করে। এর ফলে অনেক অনুচিত ও অশোভনীয় বিবাহ হয়। যেমন বৃদ্ধের সহিত শিশুকন্যার বা বৃদ্ধার সহিত শিশুপুত্রের বিবাহ। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ওই শিশুপুত্র বা শিশুকন্যা যখন বিবাহের প্রকৃত বয়স প্রাপ্ত হয় তখন প্রথম বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সে বিনা অনুষ্ঠানে ও পুরোহিতের সাহায্য ব্যতিরেকে নূতন করে বিবাহ করতে পারে। এরূপ বিবাহকে "নান্‌তারা" বলা হয়।

পাত্রী যদি কোষ্ঠী-ঠিকুজির ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারে তা হলে অভিভাবকরা পাত্রের অভিভাবকদের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হয়। এই কথাবার্তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিবাহের বরপণ নির্ণয়

করা। তবে পাত্রপক্ষ যদি আগে থাকতেই আভাস পায় যে, কন্যাপক্ষ তাদের মনোমত পণ দিতে অক্ষম, তা হলে কন্যাপক্ষকে সাফ জবাব দিয়ে দেয় যে কোষ্ঠীর মিল নেই। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা বরের জন্য পণ চায় আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা পণ চায় কন্যার জন্য। বরের পণের কোন সীমা নেই। কিন্তু মেয়ের পণের জন্য সাধারণত ১০০ থেকে ৫০০ টাকা চাওয়া হয়। উত্তর ভারতের সর্বত্রই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা পণ ব্যতিরেকে কখনও মেয়ের বিয়ে দেয় না। মেয়ের কি মূল্য হবে সেটা সাধারণতঃ মেয়ের বয়সের উপর নির্ভর করে। মেয়ের বয়স যত কম হয়, কন্যাপণ তত কম হয়। আবার কুমারীর ক্ষেত্রে কন্যাপণ বেশী, বিধবার পক্ষে কম। বরপণের ক্ষেত্রে বরের পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ও বরের শিক্ষা-দীক্ষা ও উপার্জনশীলতার উপর এর তারতম্য নির্ভর করে। সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বরপণ প্রথা নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহের মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে। এর কারণ তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও উচ্চবর্ণকে অনুকরণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিহারের যাদব মহাতোদের মধ্যে কন্যাপণ নেওয়াই প্রথাগত রীতি। কিন্তু বর্তমানে যে স্থলে বর লেখাপড়া শিখেছে সে স্থলে কন্যাপণের পরিবর্তে বরপণ চাওয়া হচ্ছে। অর্থনীতির যোগান-চাহিদা বিধি যে বিবাহ ক্ষেত্রেও কার্যকরী, এটা তারই প্রমাণ।

পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের অব্যবহিত পরেই যৌনসঙ্গম দ্বারা সিদ্ধ-বিবাহকে পূর্ণাঙ্গতা দেওয়া হয়। ভারতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকার দরুন এটা স্থগিত রাখা হতো। এই কারণে কন্যা বিবাহের পর পিতৃগৃহেই থাকতো এবং আর একটা অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করে তবে তাকে স্বামীগৃহে পাঠানো হতো। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। যেমন, গৌণা, গর্ভাধান, দ্বিরাগমন, ডোলি, রুকষতি ইত্যাদি। সাধারণতঃ প্রথম ঋতুসঞ্চারের সময়ই এই অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হতো। অনেক জায়গায় একে দ্বিতীয় বিবাহ বা "ফলবিয়া" (ফল বিবাহ) বলা হতো। সাধারণতঃ প্রথম রজদর্শনের ষোল

দিনের মধ্যে প্রথম চারদিন বাদ দিয়ে যে কোন যুগ্মদিনে এই অনুষ্ঠানটি নিষ্পন্ন হতো। আগেকার দিনে এই উপলক্ষে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধাদিরও ব্যবস্থা ছিল। তবে তার প্রচলন এখন আর নেই। বস্তুত বর্তমান সময়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটিই বঙ্গদেশ থেকে তিরোহিত হয়েছে। কিন্তু ৫০।৬০ বছর আগে পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঘরে ঘরে উৎসবের আড়ম্বর দেখা যেতো। স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয়ে "নব পুষ্পোৎসবে" সূর্যকে অর্ঘদান করতেন। স্বামী পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে গর্ভের মঙ্গল কামনা করে বৈদিক মন্ত্রপাঠও করতেন। বধূকে রজদর্শনের দিন থেকে নানারকম নিয়মনিষ্ঠ ও সংযত হয়ে গৃহের নিভৃতস্থানে থাকতে হতো ও নির্দিষ্ট দিনে একটি পুঁটলিতে নানারকম ফল বেঁধে তাকে দেওয়া হতো একটি প্রস্তর খণ্ডকে সন্তান কল্পনা করে। প্রসবের অভিনয়ও করা হতো। মেয়েরাই সাধারণতঃ এই উৎসবে যোগদান করতেন। এই উপলক্ষে নাচগানও অনুষ্ঠিত হতো এবং তার মধ্যে অনেক সময় শালীনতার অভাবও দেখতে পাওয়া যেতো। বঙ্গদেশ থেকে যদিও এই প্রথার তিরোভাব ঘটেছে তা হলেও বিহারের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে "গৌণা" এখনও প্রচলিত আছে। বিহারে এটা ব্যয়-সাপেক্ষ অনুষ্ঠান। তবে মনে হয় বাল্যবিবাহের প্রচলন উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌণা প্রথারও অবসান ঘটবে।

গত ৫০ বছরের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন ভারতে অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। ১৯২১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতে ১০ বছরের কম বয়স্ক ৮৫৮,০৮৯ জন বিবাহিত বালক ও ২,২৩৫,১৫০ জন বিবাহিতা বালিকা ছিল। আর ১০ থেকে ১৫ বৎসর বয়স্ক ২,৩৪৪,০৬৬ জন বিবাহিত বালক ও ৬,৩৩০,২০৭ জন বিবাহিতা বালিকা ছিল কিন্তু ১৯৫১ সালে ১০ বৎসরের কম বয়স্ক একজনও বিবাহিত বালক বা বালিকা ছিল না এবং ১০ থেকে ১৫ বৎসর বয়স্ক বিবাহিত বালকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল

১,৭৩৪,০০০ জন ও বালিকার সংখ্যা ৪,৪২৬,০০০ জন। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, গত ৫০ বছরের মধ্যে বাল্যবিবাহ অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছে। একথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বাল্যবিবাহ কোনদিন মালাবার উপকূলে প্রচলিত ছিল না। উত্তর প্রদেশ, বিহার, ওড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে এর যেরূপ প্রচলন ছিল, সেরূপভাবে দাক্ষিণাত্যের অন্যত্র প্রচলন ছিল না। বাল্যবিবাহের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে রিস্‌লী বলেছিলেন যে কৌলীন্যপ্রথা থেকে এটা উদ্ভূত হয়েছিল। তাঁর মতে কৌলীন্যপ্রথা যে সমাজে প্রচলিত ছিল সে সমাজে যোগ্য পাত্রের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য কন্যার পিতামাতা যত অল্পবয়সে পারতো কন্যার বিবাহ দিত। তবে আসামের কোন কোন উপজাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে এর কারণ হচ্ছে কন্যার দুষ্প্রাপ্যতা। যে সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী সে সমাজে সকলেই চেষ্টা করে বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি পারে শেষ করে ফেলতে, পাছে কন্যার অভাবে বিয়েটা ফস্‌কে যায়। তবে হিন্দুসমাজে সাধারণভাবে বাল্যবিবাহের ব্যাপকতার কারণ মনে হয় এ সম্বন্ধে স্মৃতির অনুশাসন।

বাল্যবিবাহ এখন আইনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ১৯২৯ সালে প্রণীত বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা, বিবাহের ন্যূনতম বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৫ ও ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদমসুমারীর পরিসংখ্যান থেকে প্রকাশ পায় যে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নি। এ ছাড়া আর একদিকেও আইনদ্বারা বিবাহের সংস্কার করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিধবাবিবাহ বৈধকরণ।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবাবিবাহ অবশ্য বরাবরই প্রচলিত আছে। উত্তর ভারত ও বিহারে এরূপ বিবাহকে সাগাই, খরাও, করেওয়া, সাঙ্গা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এ ছাড়া, আগেই বলা হয়েছে যে উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় বিবরণ প্রথাও প্রচলিত

আছে। এসব ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠভ্রাতা বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করে। অবশ্য উচ্চবর্ণের মধ্যে কোথাও দেবরণ প্রচলন নেই। এর প্রচলন আছে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে। স্মৃতিশাস্ত্রে এর নিষেধ থাকা হেতু উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এর অনুমোদন করেন না। উত্তর ভারত ছাড়া ওড়িষ্যা, গুজরাট ও কাথিয়াবারে অনেক নিম্নজাতির মধ্যে দেবরণ প্রথা প্রচলিত আছে। সেই কারণে, গুজরাটের উচ্চ-জাতি সমূহের মধ্যে "দেবর" শব্দ অতি অশ্লীল গালি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্রেও কুন্‌বীগোষ্ঠীর কোন কোন জাতির মধ্যে দেবরণ-এর প্রচলন দেখা যায়।

উত্তর ভারতে গাড়বালদেব মধ্যে হু'রকমের দেবরণ প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এক ক্ষেত্রে বিধবা তার মৃত স্বামীর গৃহেই বসবাস চালিয়ে যেতে থাকে এবং তাব সম্মতি নিয়ে দেবর যৌন-মিলনেব জন্য তার গৃহে আগমন করে। অপর ক্ষেত্রে, বিধবা তার দেবরের গৃহে গিয়ে তাব অন্যতব স্ত্রীরূপে চিবস্থায়ীভাবে বাস করে। এরূপ মিলনের ফলে যে সন্তান হয় তা বৈধ বলেই বিবেচিত হয়। এই প্রথা নিম্নগোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ, বাজপুত ও খস্‌দের মধ্যেও প্রচলিত আছে। খস্‌দের মধ্যে বিধবাকে বিবাহ কবে বিধবার গৃহেই দেবরের বাস করার রীতি প্রচলিত আছে। খস্‌দের মধ্যে এরূপ ব্যক্তিকে "কঠেলা" বা "টাকওয়া" বলা হয়। এরূপ মিলনের ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাকে "ঝটেলা" বলা হয়। যে ক্ষেত্রে বিধবা তার দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে বাস করে সে ক্ষেত্রে প্রথম স্বামীর ঔরসজাত সন্তান যদি বিপিতার গৃহে গিয়ে মাতার সঙ্গে একত্র বাস করে তাহলে সে তার প্রকৃত পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় কিন্তু তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সঙ্গে সমানভাবে বিপিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তার কারণ, হিন্দুর দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বিবাহ "চুক্তি" বিশেষ নয়। এটা হচ্ছে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বিশুদ্ধিকরণের জন্য দ্বিজাতির

মধ্যে যে দশবিধ সংস্কার আছে, বিবাহ তার মধ্যে শেষ ও চরম সংস্কার। এই সংস্কার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে হিন্দুবিবাহ আইন প্রণীত হবার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে পারতো কিন্তু সে কারণে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতো না। এক কথায় সনাতন হিন্দু-সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কখনও প্রত্যাহৃত হবার অবকাশ ছিল না, তবে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হতো এবং স্ত্রী হিসাবে সে তার পূর্বমর্যাদা হারাতো। কিন্তু উত্তর ভারতের নিম্নজাতির মধ্যে ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন উচ্চ ও নিম্নজাতির মধ্যে, বিশেষ করে যেখানে "সম্বন্ধম" প্রথার বিবাহ প্রচলিত আছে সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ কঠিন ব্যাপার নয়। উত্তর ভারতের জৌনসর বাওয়ার অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে। সেখানে একে "ছুট" বলা হয়। মুখের কথায় বা লিখিতভাবে যে কোন সময় যে কোন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারে, যে পরবর্তী পুরুষ তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে সে প্রথম স্বামীকে দ্বিগুণ "জিওধন" বা কন্যাপণ দিতে প্রস্তুত থাকে। দেরাতুনের চাকরতা তহশীলে পূর্বস্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে হলে পাত্র কর্তৃক কন্যার পিতাকে বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যয় বাবদ "জিওধন" দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। টেরি গাড়ওয়াল অঞ্চলের ডোম জাতির মধ্যেও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্মতি অনুসারে বিবাহ সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। তবে কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যতিরেকে আজকাল বিবাহ-বিচ্ছেদ সচরাচর ঘটে না।

অনেক জায়গায় আবার বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে স্ত্রীলোকের পদমর্যাদা বেড়ে যায়। দক্ষিণ ভারতের কুরুবদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক সাতবার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সে স্ত্রীলোকের পদমর্যাদা আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনেক উচ্চ। বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের

ব্যাপারে এরূপ স্ত্রীলোক সাধারণতঃ নেতৃস্থান অধিকার করে। মধ্য প্রদেশেও অনেক জাতির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। সেখানে প্রথম স্বামী কন্যাপণ ফেরত পেলেই স্ত্রীকে অনুমতি দেয় অপরের সঙ্গে চলে যেতে এবং তাকে বিবাহ করতে। তারপর পঞ্চায়েতকে ভোজন করিয়ে দিলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নূতন বিবাহ অনুমোদিত হয়। হোশাঙ্গাবাদের রাজপুতবংশীয় যাদব নামে এক উচ্চ জাতির মধ্যে কোন কোন নারী তার সমগ্র জীবনকালের মধ্যে নয়-দশবার পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে। বিহারের নিম্ন জাতি-সমূহের মধ্যেও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। এক কথায়, সমগ্র ভারতেই নিম্নশ্রেণীর কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্ত্যজ জাতিসমূহের মধ্যে বিবাহের সম্পর্ক খুব সহজভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায়। ১৯৫৬ সালে প্রণীত হিন্দুবিবাহ আইন দ্বারা হিন্দুদের মধ্যে আদালতের সাহায্যে ক্ষেত্রবিশেষে বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজ হয়ে গেছে।

কেরালার মাতৃকেন্দ্রিক ক্ষত্রিয় নায়ারজাতির মেয়েদের সঙ্গে পিতৃকেন্দ্রিক নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের এক বিচিত্র দাম্পত্যবন্ধন দেখা যায়। নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের সহিত উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের এক বৈশিষ্ট্যমূলক পার্থক্য এই যে, সামাজিক প্রথানুযায়ী নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রদ্বয়ই নিজ জাতির মধ্যে বিবাহ করতে পারে, অপর পুত্রেরা তা পারে না। তারা মাতৃকেন্দ্রিক ক্ষত্রিয় নায়ার জাতির স্ত্রীলোকদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে। এরূপ সম্পর্ককে "সম্বন্ধম" বলা হয়। নায়ারদের মধ্যে গোষ্ঠীকে "তারবার" বলা হয়। কোন এক বিশেষ তারবারভুক্ত নায়ার-রমণীর সহিত কোন নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণপুত্রের যে "সম্বন্ধম" সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেই সম্পর্কবলে সেই নায়ার-রমণীকে গর্ভবতী করবার অধিকার তার থাকে। তবে নায়ারদের মধ্যে যে সাধারণ নিয়মানুগ বিবাহ প্রচলিত নেই, এমন নয়। সাধারণ নিয়মানুগ বিবাহপ্রথাও তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে এরূপ বিবাহ সাময়িক ও বিকল্প বিবাহ

মাত্র। যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে নায়ার-কুমারীদের নিজ জাতিভুক্ত কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়। পরে এই বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, নায়ার-রমণী যে কোন নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের সঙ্গে দাম্পত্যসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। "সম্বন্ধম" সম্পর্ক অবিনশ্বর নয়। অনেক সময় কোন কোন নায়ার-রমণীকে পরপর ১০।১২ জন নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের সঙ্গে "সম্বন্ধম" স্থাপন করতে দেখা যায়। নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ কখনও তার নায়ার স্ত্রীর গৃহে গিয়ে বাস করে না। নায়ার স্ত্রীও কখনও তার নাম্বুদ্রী স্বামীর ঘরে যায় না। নায়াররা মাতৃকেন্দ্রিক জাতি, সুতরাং বিবাহের পর কখনও স্বামীগৃহে যায় না। সাধারণতঃ নাম্বুদ্রী স্বামী সন্ধ্যার পর যৌনমিলনের জন্য নায়ার-স্ত্রীর গৃহে আসে এবং মিলনান্তে পুনরায় নিজ পিতৃকেন্দ্রিক পরিবারের মধ্যে ফিরে যায়। অনেক সময় নায়ার-রমণী একইকালে একাধিক নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের সঙ্গে "সম্বন্ধম" সম্পর্ক স্থাপন করে। এরূপ ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ বহুপতিক বিবাহের রূপ ধারণ করে। যে ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক এইভাবে বহুপতিক বিবাহের রূপ ধারণ করে সে ক্ষেত্রে সকল স্বামীরই ওই নায়ার-রমণীর উপর সমান যৌনাধিকার থাকে। একজন স্বামী এসে দ্বারদেশে যদি অপর স্বামীর ঢাল বা বর্শা দেখতে পায় তা হলে সে প্রত্যাগমন করে ও পরবর্তী সন্ধ্যায় পুনরায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে আসে।

আগেই বলা হয়েছে যে, নায়ার-পরিবার মাতৃকেন্দ্রিক। এ ধরনের পরিবার গঠিত হয় স্ত্রীলোক স্বয়ং ও তার ভ্রাতা, ভগিনী ও তাদের সন্তানদের নিয়ে। কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের স্বামী বা বিবাহিতা পুরুষের স্ত্রী এই পরিবারের মধ্যে বাস করে না। আগে আরও বলা হয়েছে যে সম্বন্ধম্ ব্যতীত নায়ারদের মধ্যে নিয়মানুগ সাধারণ বিবাহপ্রথাও প্রচলিত আছে। সেক্ষেত্রেও নায়ার-স্বামী অন্যত্র বাস করে এবং নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের মত সেও সন্ধ্যার পর স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলনের জন্য স্ত্রীর গৃহে এসে উপস্থিত হয়।

হিন্দুদের মধ্যে বৃক্ষ বা জড়পদার্থের সঙ্গে বিকল্প বিবাহেরও প্রথা আছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, বিবাহে অযুগ্ম সংখ্যা অত্যন্ত অশুভ। সেই কারণে কোন ব্যক্তি যখন তৃতীয়বার বিবাহ করতে প্রবৃত্ত হয় তখন সে অযুগ্ম তৃতীয় বারের অশুভতা খণ্ডন করবার জন্য কোন বৃক্ষ বা জড়পদার্থের সঙ্গে বিকল্প বিবাহের পর নির্বাচিত কন্যাকে বিবাহ করে। বিহারের কোন কোন জায়গায় অবিবাহিত ব্যক্তি যদি কোন বিধবাকে বিবাহ করতে মনস্থ করে, তা হলে সে প্রথমে কোন শ্যাওড়া গাছের সঙ্গে বিকল্প বিবাহ সম্পন্ন করে এবং পরে ওই বিধবাকে বিবাহ করে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন শাখোটক বৃক্ষের (শ্যাওড়া গাছ) শাখা নামিয়ে তা পুষ্পমাল্যদ্বারা বরের হাতের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর বিধবাকে সেখানে উপস্থিত করান হয়। বিধবা তখন বরের সঙ্গে মাল্যবিনিময় করে এবং বরের দেওয়া মালা হাতে পরে। এই ভাবে শাখোটক বৃক্ষ বরের প্রথমা স্ত্রী হয় এবং ঐ বিধবা তার দ্বিতীয়া স্ত্রীরূপে পরিগণিত হয়।

কোণ্টাজাতির মধ্যে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে যে, যদি কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন বিধবাকে বিবাহ করে তবে মৃত্যুর পর তাকে প্রেত হয়ে থাকতে হয়। সেই কারণে কোন বিধবাকে বিবাহ করার আগে কোণ্টা অবিবাহিত যুবক কোন ফুলকে বিকল্প বিবাহ করে। হালওয়াইজাতির মধ্যে এরূপ বিকল্প বিবাহ সিন্দুর-লিপ্ত কোন তরবারী বা লৌহখণ্ডের সঙ্গে হয়। বঙ্গদেশে বাগদীজাতির মধ্যেও বিবাহ করবার আগে অবিবাহিত যুবক প্রথমে কোন মহুয়া গাছের সঙ্গে বিকল্প বিবাহ সম্পন্ন করে। খারওয়ারজাতির মধ্যে এরূপ বিকল্প বিবাহ যে শুধু পুরুষকেই করতে হয় তা নয়, বিধবাকেও করতে হয়। এক্ষেত্রে এরূপ বিবাহ আম্রবৃক্ষের সহিত নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু ছোটনাগপুরের কুর্মিদের মধ্যে পুরুষ ও বিধবাকে বিভিন্ন বৃক্ষকে বিবাহ করতে হয়। তাদের

মধ্যে সাধারণতঃ বিধবার বিবাহ হয় মহুয়া গাছের সঙ্গে আর পুরুষদের বিবাহ হয় আম্রবৃক্ষের সহিত। কুর্মিদের মধ্যে এরূপ বিবাহে আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের আধিক্য লক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে বিধবা তার ডান হাতে মহুয়া পাতা দিয়ে তৈরী বালা পরে সাত-বার মহুয়া গাছটিকে প্রদক্ষিণ করে। তার ডান হাত ও কান মহুয়া গাছের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় ও তাকে মহুয়া গাছের পাতা চিবুতে দেওয়া হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে আমগাছটিকে নয়বার প্রদক্ষিণ করতে হয়। মহিলিজাতির মধ্যেও অনুরূপ প্রথা ও অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে।

আগেকার দিনে রজদর্শনের পূর্বে কন্যার বিবাহ না দিলে তার পিতামাতাকে সামাজিক কলঙ্ক বহন করতে হতো। এরূপ কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বিহারের খণ্ডজাতির অন্তর্ভুক্ত গোনর-উপশাখার লোকেরা তরবারীর সঙ্গে কন্যার বিকল্প বিবাহ দিত। কন্যার কোনরূপ বিকলাঙ্গতার জন্য বিবাহ হবে না এরূপ মনে হলেও কন্যার বিকল্প বিবাহ দেওয়া হতো। প্রথম রজদর্শনের অব্যবহিত পূর্বে ওড়িষ্যাতেও কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় কোন পুষ্প, বৃক্ষ বা তীরের সঙ্গে। ওড়িষ্যার চাষাজাতির মধ্যে এরূপ বিবাহে পুরোহিত ওই পুষ্প, বৃক্ষ বা তীর কুশরজ্জুর সাহায্যে কন্যার হাতের সঙ্গে বেঁধে দেয়। প্রকৃত স্বামীর ন্যায় কন্যা সারাজীবন সেই পুষ্প, বৃক্ষ বা তীরকে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ও তার নাম উচ্চারণ করে না। পরে যখন কোন লোকের সঙ্গে ওই কন্যার বিবাহ হয় তখন সেই বিবাহকে “দ্বিতীয়া” বিবাহ বলা হয়। ওদের মধ্যে বিধবার পুনরায় বিবাহকেও “দ্বিতীয়া” বিবাহ বলা হয়। দ্বিতীয়া বিবাহের এক বিচিত্র আনুষ্ঠানিক উপসঙ্গের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিবাহ বরের উপস্থিতিতে না হয়ে তার অনুপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। এরূপ বিবাহে সাধারণতঃ বরের ছোট ভাই এসে কনের হাতে বালা পরিয়ে দেয়।

বঙ্গদেশে গণিকাদের মধ্যেও বিকল্প বিবাহ প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে হিন্দু গণিকাদের মধ্যে বিবাহ সাধারণত কোন জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বা ভাড়া করা বৈষ্ণব বা কোন গাছের সঙ্গে দেওয়া হয়। মুসলমান গণিকারা কিন্তু এরূপ বিবাহ তরবারী বা ছুরিকার সঙ্গে করে। হিন্দু গণিকাদের ক্ষেত্রে ওই বৃক্ষকে যত্নসহকারে জল দিয়ে পালন করা হয় আর মুসলমান গণিকারা ওই তরবারী বা ছুরিকা সযত্নে কোন পেটিকার মধ্যে রক্ষা করে। তাদের বিশ্বাস যে, কোনক্রমে এগুলি বিনষ্ট হলে কন্যা বিধবা হবে।

। ছয় ।

আদিবাসীর সমাজ সংগঠন ও বিবাহ

আদিবাসীসমাজ সংগঠিত হয় উপজাতি বা ট্রাইবের ভিত্তিতে। প্রত্যেক ট্রাইবেরই স্বকীয় ভাষা ও কৃষ্টি আছে। প্রায়ই ট্রাইবগুলি বহু শাখায় বিভক্ত হয়। ট্রাইব ও তার শাখাগুলি সাধারণত অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী। যদি কেউ ট্রাইব বা তার শাখার বাইরে বিবাহ করে তা হলে তাকে ট্রাইব থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়। ট্রাইব বা তার শাখাগুলি আবার কতকগুলি উপশাখা বা দলে বিভক্ত হয়। এই সকল উপশাখা বা দলগুলি হচ্ছে বহির্বিবাহের গোষ্ঠী। আদিবাসীর মধ্যে বহির্বিবাহেব এই গোষ্ঠীগুলি সাধাবণত টটেম-ভিত্তিক। তাব মানে প্রত্যেক গোষ্ঠীরই এক একটি নিজস্ব টটেম আছে। একই টটেমবিশিষ্ট গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ পবস্পরকে বিবাহ করতে পাবে না। তাদেব বিয়ে কবতে হয় অন্য টটেম গোষ্ঠীতে। তবে, বহির্বিবাহের 'এই গোষ্ঠীগুলি যে সব ক্ষেত্রেই টটেমভিত্তিক হয়, তা নয়। অনেক সময় এগুলি গ্রামভিত্তিক হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে একই গ্রামের ছেলেমেয়েরা পরস্পবকে বিবাহ করতে পারে না। কেননা, তাদের বিশ্বাস এই যে, একই গ্রামের সকল অধিবাসীব মধ্যে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এবং সেই কারণে তাদের মধ্যে রক্তের ঐক্যতা আছে। এই রক্তের ঐক্যতাহেতু তাদের মধ্যে কখনও বিবাহ হতে পারে না। তাদের অন্য গ্রামে বিবাহ করতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, একই টটেমের লোকেরা একই গ্রামে বাস করে। এরূপ ক্ষেত্রে টটেমনিষিদ্ধ বিবাহবিধান স্বয়ংচল হয়ে গ্রামনিষিদ্ধ বিবাহবিধানে পরিণত হয়।

অনেক জায়গায় আবার বিবাহ ব্যাপারে একটা গ্রাম-ক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। যথা "ক" গ্রামের মেয়ের বিয়ে হয় "খ" গ্রামের ছেলের সঙ্গে আবার "খ" গ্রামের মেয়ের বিয়ে হয় "গ" গ্রামের ছেলের সঙ্গে—এরূপভাবে যেখানে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি গ্রাম-ভিত্তিক সেখানে এরূপ গোষ্ঠীগুলিকে আদিবাসীদের ভাষায় "খেরা", 'গোচী', "খেল" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। যেখানে আদিবাসী জীবনের উপর হিন্দু প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে সেখানে এগুলিকে 'গোত' বা 'গোত্র' বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই 'গোত' বা "গোত্র"গুলি টটেমভিত্তিক। যেমন—মধ্যভারতের গোণ্ডসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত গোত্রগুলি হচ্ছে 'মারকাম', 'টেকম', 'নৈতাম' ইত্যাদি। মারকাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আম, টেকম-এর অর্থ হচ্ছে সেগুন ও নৈতাম-এর অর্থ হচ্ছে কুকুর। গোত্রের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এই সকল সমাজে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। সগোত্রে বিবাহ করলে দণ্ড পেতে হয়। হিন্দুদের মত এই সকল সমাজে বিবাহের পর পুরুষদের গোত্র অপরিবর্তিত থাকে, কেবল বিবাহের পর মেয়েদের গোত্রেরই পরিবর্তন ঘটে। হিন্দুসমাজের সপিণ্ডবিধানের অনুসরণে আদিবাসীদের মধ্যেও অনেকস্থানে আবার পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে নির্দ্দিষ্ট পুরুষ পর্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। যেমন—উত্তর প্রদেশের ভানটুদের মধ্যে বিবাহের জন্য মাতামহীর কুলে দুই পুরুষ বর্জন করার বিধি আছে। মধ্যপ্রদেশের ভীলজাতির মধ্যেও মাতৃকুলে দুইপুরুষ বর্জন করার রীতি আছে। এছাড়া তারা পিতামহীর ও মাতামহীর কুলেও তিন পুরুষ বর্জন করে।

ভীলেরা ৪১টি বহির্বিবাহের দলে বিভক্ত এবং সেগুলি সবই টটেমভিত্তিক। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট ও মাণ্ডালা অঞ্চলের বাইগারা অনেকগুলি অন্তর্বিবাহের শাখায় বিভক্ত। প্রতি শাখা আবার অনেকগুলি বহির্বিবাহের দলে বিভক্ত। এখানে প্রত্যেক লোককেই নিজ শাখার মধ্যে বিবাহ করতে হয়; কিন্তু নিজ দলে বিবাহ করতে

পারে না, অপর দলে বিবাহ করতে হয়। কেবল তাই নয়, তাদের এমন দলে বিবাহ করতে হয় যে-দল তাদের মত একই দেবদেবীর পূজা করে। অনেক স্থলে আবার কৌলীন্যপ্রথাও প্রচলিত আছে। যেমন মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডজাতির মধ্যে দুটি বিভাগ আছে—রাজগোণ্ড ও ধরগোণ্ড। ধরগোণ্ডের পিতারা রাজগোণ্ডে কন্যা দান করে। কিন্তু রাজগোণ্ডের পিতারা কখনও ধরগোণ্ডে মেয়ে দান করে না।

বস্তার জেলার মারিয়াদের মধ্যে দলের যে সমস্ত লোক পরস্পরের সহিত "দাদাভাই" সূত্রে আবদ্ধ তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। কিন্তু অপর যে দল তাদের সহিত "মামাভাই" সূত্রে আবদ্ধ মাত্র তাদের সঙ্গেই বিবাহ হয়।

মধ্যপ্রদেশের কোলজাতিরা অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত। এই সকল শাখাগুলিকে "কুরি" বলা হয়। এদের মধ্যেও কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত আছে। কুরিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কুরি হচ্ছে রাউতিয়া। রাউতিয়ারা কখনও পরবর্তী (কুরি) ঠাকুরিয়া কুরিতে কন্যা দান করে না কিন্তু ঠাকুরিয়া কুরি থেকে মেয়ে নিতে তাদের কোন আপত্তি নেই। রাউতিয়ারা রাউনতেল কুরি থেকেও মেয়ে নেয়। কিন্তু তাদের কখনও মেয়ে দেয় না। কাঠাওটিয়া নামে আর একটি কুরি ঠাকুরিয়াদের কুরি থেকে মেয়ে নেয়। কিন্তু কখনও মেয়ে দেয় না। তবে এক্ষেত্রে কাঠাওটিয়ারা মেয়েটিকে সাধারণত "রক্ষিতা" হিসাবে রাখে, "পরিণীতা" হিসাবে নয়। তবে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোলেদের মধ্যে কুরিগুলি হচ্ছে অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী, বহির্বিবাহের গোষ্ঠী নয়। মাত্র কৌলীন্যপ্রথার জন্য এগুলি কোন কোন স্থলে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীর রূপ পেয়েছে। যেহেতু কুরিগুলির মধ্যে কোন গোত্রবিভাগ নেই সেহেতু অনুমান করা যেতে পারে যে কোলেদের মধ্যে বিবাহ সগোত্রেই হয়। তবে যেখানে কৌলীন্যপ্রথা অবলম্বিত হয়, মাত্র সেখানেই সগোত্র বিবাহ বর্জিত হয়। তবে কোলেদের মধ্যে এমন অনেক স্মারক চিহ্ন আছে

যা থেকে পরিষ্কার প্রকাশ পায় যে, কোলেদের মধ্যে বিবাহ এক সময় গ্রামভিত্তিক ছিল।

সাঁওতালদের মধ্যে এক সময় ১২টি বহির্বিবাহের গোষ্ঠী ছিল। এর মধ্যে একটি এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে মাত্র ১১টি গোষ্ঠী আছে। এগুলি সবই বহির্বিবাহের গোষ্ঠী। তবে এদের মধ্যে কিস্‌কু বা মুরমুগোষ্ঠীর মর্যাদা অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক উচ্চ। এছাড়া মানভূমে কোন কোন জায়গায় ধর্মের ভিত্তিতে সাঁওতালরা তুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। এ তুটির নাম—দেশওয়ালী ও থৌরা। দেশওয়ালীরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। আর থৌরারা জড়োপাসনার উপর বিশ্বাস রাখে। দেশওয়ালীদের সঙ্গে থৌরাদের কখনও বিবাহ হয় না।

রাঁচী জেলার ওরাঁওদের মধ্যে বহির্বিবাহের জন্য যে গোত্র-বিভাগ আছে সেগুলিকে "পরী" বলা হয়। পরীগুলি টটেম-ভিত্তিক। এক পরীর ছেলেকে অপর কোন পরীতে বিবাহ করতে হয়। গডাবা উপজাতির মধ্যেও গোত্রবিভাগকে পরী বলা হয়। একই পরীর মধ্যে তারা কখনও বিবাহ করে না। এমন কি পরীর ভেতর ব্যভিচারও গুরুতরভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়।

মানভুমের সাঁওতালদের মত খরিয়ারাও তুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত—শবর খরিয়া ও পাহাড়ীয়া খরিয়া। একের সঙ্গে অপরের কখনও বিবাহ হয় না। তবে এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন মর্যাদা-মূলক বিভেদ নেই। খরিয়াদের বিশ্বাস তারা রামায়ণ-বর্ণিত বানররাজ অঙ্গদের বংশধর।

ওড়িষ্যার কোরাপুট জেলার পরোজাদের মধ্যেও বহির্বিবাহের জন্য গোত্রবিভাগ দেখা যায়। ওড়িষ্যার পারলাকিমেদির শবরদের মধ্যেও গোত্রবিভাগ আছে। তবে এ সকল ক্ষেত্রে গোত্রগুলি টটেম-ভিত্তিক নয়, এগুলি গ্রামভিত্তিক। তার মানে একই গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কখনও বিবাহ হয় না। এক গ্রামের মেয়েকে বিবাহ

করতে হয় অপর গ্রামের ছেলেকে। তাদের বিশ্বাস এই যে একই গ্রামের ছেলেমেয়েরা পরস্পর ভাইবোন। সুতরাং তাদের মধ্যে কখনও বিবাহ হতে পারে না। তবে কোন নবাগন্তুক এসে যদি গ্রামে বাস করে তবে তার সঙ্গে তারা গ্রামের মেয়ের বিয়ে দেয়। তামিলনাড়ুর বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি হয় টটেমভিত্তিক আর তা নয় তো গ্রামভিত্তিক। কোচিনের কাদার উপজাতির মধ্যে যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীসমূহ আছে সেগুলি সবই গ্রামভিত্তিক। সেখানে তারা একই গ্রামের মধ্যে কখনও ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয় না।

ত্রিবাঙ্কুরের উপজাতিসমূহের মধ্যেও বহির্বিবাহের গোষ্ঠী আছে। এগুলি দলভিত্তিক। কিন্তু পাহাড়ীয়া পান্তারামদের মধ্যে কোন দল বিভাগ নেই। তাদের মধ্যে তিন চারটি করে পরিবার নিয়ে এক একটি বহির্বিভাগের গোষ্ঠী গঠিত হয়। তবে এ সকল গোষ্ঠীর কোন স্বতন্ত্র নাম নেই।

ত্রিবান্দ্রমের কানিকাররা চারটি দলে বিভক্ত। এই চারটি দলের নাম হচ্ছে—মুট্রা-ইলোম, মেন-ইলোম, কায়-ইলোম এবং পাল-ইলোম। ইলোম শব্দের অর্থ হচ্ছে গোত্র। এদের মধ্যে মুট্রা-ইলোম ও মেন-ইলোম দল নিজেদের মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ মনে করে। এই দুটি দলের মধ্যে এক দলের ছেলেমেয়ের সঙ্গে অপরদলের ছেলেমেয়ের বিবাহ হয় কিন্তু অপর দুটি দলের সঙ্গে এদের কোন বৈবাহিক আদান-প্রদান নেই। তবে এ ক্ষেত্রে চারটি দলেরই বহির্বিবাহের গোষ্ঠী আছে এবং বিবাহের সময় তারা নিজেদের গোষ্ঠী বর্জন করে। ত্রিবান্দ্রমের আর এক জায়গায় কানিকাররা দুটি শাখায় বিভক্ত—অন্নন-থামবি ও মাচামবি। অন্নন-থামবিরা মেন-ইল্লোম, পেরিন-ইল্লোম ও কায়-ইল্লোম দলে বিভক্ত আর মাচামবিরা বিভক্ত মুট-ইল্লোম, বেলানট-ইল্লোম ও কুরু-ইল্লোম দলে। এদের মধ্যে এক দলের ছেলের সঙ্গে কখনও অপর দলের মেয়ের বিবাহ হয় না। এক সময় এদের মধ্যে যে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের প্রচলন ছিল তা তাদের সন্তানদের দলভুক্তি

থেকে বোঝা যায়। যেমন—কুরু-ইল্লম দলের স্বামীর ঔরসে পেরিন-ইল্লম দল থেকে আনীত স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান হয় সে মাতার দলভুক্ত হয়, কখনও পিতার দলের লোক বলে পরিচিত হয় না। ত্রিবাঙ্কুরের মাল-আরায়নদের মধ্যেও সন্তান মাতার দলভুক্ত হয়, কখনও পিতার দলভুক্ত হয় না। আবার মল-বেদনদের মধ্যে বিবাহের পর স্ত্রী কখনও নিজের দলচ্যুত হয় না এবং সন্তান মাতারই কুল পায়। উরালীদের মধ্যেও সন্তান মায়েরই কুল পায়, পিতার নয়। মান্নানদের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত।

আসামের উপজাতিসমূহ মঙ্গোলীয় মানবশাখার অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে পিতৃকেন্দ্রিক ও মাতৃকেন্দ্রিক উভয় প্রকারের সমাজই প্রচলিত আছে। খাসিয়ারা মাতৃকেন্দ্রিক। তারা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত। আবার প্রতি শাখার মধ্যে অসংখ্য বহির্বিবাহের দল বা উপদল আছে। আসামের মিকিরজাতির সমাজব্যবস্থা পিতৃকেন্দ্রিক। এরা পাঁচটি দলে বিভক্ত। প্রতিদলের মধ্যে বিভিন্ন উপদল আছে। মাত্র উপদলগুলিই বহির্বিবাহের দল হিসাবে ক্রিয়াশীল। দলের ভেতর কখনও বিবাহ হয় না। কেননা এদের বিশ্বাস যে, দলের সকলেই পরস্পরের ভাইবোন। সেই কারণে তাদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না। লাখেরদের মধ্যে কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, তারা ইচ্ছামত দলের বাইরে বা ভেতরে বিবাহ করতে পারে। কাছারের পাহাড়ী কাছারীরা ২০টি দলে বিভক্ত। এদের সাতটি দলকে "পুরুষ" দল বলা হয় আর ১৩টিকে বলা হয় "মেয়ে" দল। এদের মধ্যে ছেলেরা কখনও মায়ের দলে ও মেয়েরা কখনও বাপের দলে বিয়ে করতে পারে না। উত্তর কাছারের কুকীরা চারটি দলে বিভক্ত। এখানে দলগুলি অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে কার্যকর থাকলেও এক দলের ছেলের সঙ্গে অপর দলের মেয়ের বিবাহ বিরল নয়। যেখানে এরূপ দলের বাইরে বিবাহ হয় সেখানে বিবাহের পর নারী স্বামীর দলাখ্যা পায়। কিন্তু খেলমাকুকীদের মধ্যে স্বতন্ত্র

নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এখানে দলগুলি অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে ক্রিয়া করে। অনেক সময় একদলের সঙ্গে অপর দলের ছেলেমেয়েদের বিবাহ হয় বটে কিন্তু এরূপ বিবাহ দুষিত বলে গণ্য হয় এবং যে ক্ষেত্রে এরূপ বিবাহ হয় সেক্ষেত্রে সেই পুরুষ পিতা-মাতার শ্রাদ্ধাদি কাজের অধিকারী হয় না। একারণে প্রতি পরিবারেরই লক্ষ্য থাকে যে পিতামাতার শ্রাদ্ধাদির জন্য পরিবারের অন্তত একজন যেন নিজ দলে বিবাহ করে। তবে এরূপ দলবহির্ভূত বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী কখনও স্বামীর দলাখ্যা পায় না।

আদিবাসীদের সমাজ সংগঠনের যে সমীক্ষা এই অধ্যায়ে দেওয়া হলো তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আদিবাসী সমাজে বহির্বিবাহ সাধারণভাবে প্রচলিত। আদিবাসীদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি টটেমভিত্তিক বা গ্রামভিত্তিক বা যে রকম ধরণেরই হউক না কেন, তাদের বিশ্বাস যে বহির্বিবাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক হচ্ছে ভাইবোনের সম্পর্ক এবং সেই কারণে সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিবাহ হতে পারে না। আদিবাসীরা কেন নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করে না সে সম্বন্ধে তাদের প্রশ্ন করলে তাদের কাছ থেকে নিয়ত এই উত্তরই পাওয়া যায়। এটা সকলেরই জানা আছে যে জগতের সর্বত্র পরিবারই বহির্বিবাহের ক্ষুদ্রতম সংস্থা হিসাবে ক্রিয়া করে। কেননা পরিবারের মধ্যে যৌনমিলন অজাচার স্বরূপ গণ্য হয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে পরিবারের মধ্যে যৌনাচার সম্পর্কে যে অলঙ্ঘনীয় বিধিনিষেধ আছে তা থেকেই দলগত বা গোষ্ঠীগত বহির্বিবাহ প্রথার উদ্ভব হয়েছে।

আদিবাসীদের মধ্যে বিবাহের জন্য যে সামাজিক সংগঠন আছে এতক্ষণ সে সম্বন্ধেই বলা হলো। এবার আদিবাসী সমাজে বিবাহের রকমফেরের কথা কিছু বলা যাক। একথা আগেই বলা হয়েছে যে প্রাচীন ভারতে রাক্ষস, আসুর ইত্যাদি বিবাহপ্রথা আর্যগণ কর্তৃক

আদিবাসী সমাজ থেকেই গৃহীত হয়েছিল। রাক্ষস বিবাহ বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের ভীলজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। এরূপ বিবাহকে ভীলেরা "ঘিসকরলেজানা" বলে। তার মানে যে বিবাহে মেয়েকে কেড়ে আনা হয়েছে। ৩০।৪০ বছর আগে পর্যন্ত এরূপ বিবাহ সচরাচর ঘটতো। এরূপ বিবাহের প্রশস্ত সময় ছিল ভাগোরিয়া উৎসবের দিন। ভাগোরিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হতো হোলিপর্ব উপলক্ষে "মেড়া" পোড়ানোর আগের দিনে। সাধারণত বর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে কোন গ্রামে প্রবেশ করতো ও মেয়েটিকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আসতো। তারপর একটা সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানেব মাধ্যমে বিবাহকে নিয়মানুগত করে নেওয়া হতো। মধ্যপ্রদেশের চানডা ও বস্তাব জেলার গোণ্ডদের মধ্যেও পূর্বে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এরূপ বিবাহকে দণ্ডবিধি আইন অনুসারে অপরাধ বলে গণ্য করে শাস্তি দেওয়ার ফলে আদিবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে এ সম্পর্কে এক বিকল্প পন্থা অবলম্বন করেছে। এরা প্রথমে বর-কনের মধ্যে বিবাহ স্থির করে এবং পরে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবার সময় পূর্বকালেব রীতি অনুযায়ী কনেকে কেড়ে নেওয়ার একটা কপট অভিনয় কবে মাত্র। দক্ষিণ ভাবতে ত্রিবাঙ্কুরের মুড়ুবনদের মধ্যেও মেয়ে কেড়ে নিয়ে এবকম বিবাহেব প্রচলন আছে।

যেখানে মেয়েকে এভাবে কেড়ে নিয়ে আসা হতো সেখানে একদলের সঙ্গে অপর দলের যে দ্বন্দ্ব হতো সে দ্বন্দ্ব যে অনেক সময় চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বে পরিণত হতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরূপ দ্বন্দ্ব পরিহারের জন্য উভয় দলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বভাবে কন্যা-বিনিময় প্রথার উদ্ভব হয়। কন্যা-বিনিময় প্রথার পিছনে যে যুক্তি আছে তা হচ্ছে স্ত্রীলোক জননশক্তির উৎস। কোন স্ত্রীলোককে যদি কেহ দল থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় তা হলে দলের জনন-শক্তির ভাণ্ডার হ্রাস পায়। সুতরাং কন্যা-বিনিময় দ্বারা ঐ ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে হবে। এ ছাড়া উপজাতিসমাজে মেয়েরা নিজ শ্রম দ্বারা দলের অর্থনৈতিক উৎপাদনে সাহায্য করে। সেইহেতু তারা

দলের আর্থিক সম্পদ স্বরূপ। বিবাহের পর কন্যা অপর দলে চলে গেলে আর্থিক সম্পদ ভাণ্ডারের যে ক্ষয় ক্ষতি হয় তা পূরণ করাও কন্যা-বিনিময় প্রথার উদ্দেশ্য। কন্যা-বিনিময় প্রথা ত্রিবাঙ্কুরের পাহাড়িয়া পানতারাম ও উরালীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। বস্তুত উরালীদের মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণভাবে বিনিময় প্রথার উপর স্থাপিত। এদের সমাজে কন্যাপণ দিয়ে স্ত্রী পাওয়া যায় না। যখন কোন যুবক বিবাহ করতে চায় তখন তাকে নিজের কোন বা অপর কোন আত্মীয়াকে অপর দলের হাতে সমর্পণ করে তবে স্ত্রী সংগ্রহ করতে হয়। এরূপ বোন বা আত্মীয়া যে যুবতী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে-কোন বয়সের বোন বা আত্মীয়া হলেই চলে, কেবল তাকে স্ত্রীলোক হতে হবে। এই কারণে আগেকার দিনে উরালী-সমাজে কোন যুবকের যতগুলি বোন থাকতো তার ততগুলি বিবাহ করবাব সম্ভাবনা ছিল।

আর এক রকম রাক্ষস বিবাহ আদিবাসীসমাজে প্রচলিত আছে। একে বলা হয় "সিন্দুর ঘষা" বিবাহ। সিন্দুর ঘষা বিবাহ অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে। এটা বিশেষ করে প্রচলিত আছে আমাদের ঘরের কাছে সাঁওতালসমাজে। এ বিবাহে পুরুষ হাটে বা বাজারে জোর কবে কোন মেয়ের সিঁথিতে সিন্দুর ঘষে দেয়। সিন্দুর ঘষে দেবার পর উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হয়ে যায়। মেয়ে যদি বরকে পছন্দ না করে তা হলেও তার সঙ্গে তাকে ঘর করতে হয়। তার কারণ, সিন্দুর-ঘষা মেয়েকে সমাজে আর কেউ বিবাহ করে না।

অসুর বিবাহ রাক্ষস বিবাহেরেই এক অনুকৌশল মাত্র। যে-স্থলে কোন কারণবশত কন্যা বিনিময় করা সম্ভবপর হতো না সেস্থলে কন্যার পরিবর্তে তার মূল্য ধরে দেওয়া হতো, যাতে অপর দল ঐ পণের বিনিময়ে অপর কোন দল থেকে কন্যা ক্রয় করে দলের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে পারতো। এইভাবে কন্যাপণ প্রথার উদ্ভব

হয়েছিল। কন্যাপণ যে মাত্র টাকা-পয়সাতেই দেওয়া হয়, তা নয়। অনেক সময় কন্যাপণ অন্যরকম ভাবেও দেওয়া হয়। যেমন—শ্রমদান করে। এ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে পণ দিয়ে মেয়ে কেনা ঠিক ক্রীতদাসী কেনা বা অন্য পণ্যদ্রব্য কেনার মত নয়। কেননা ক্রীতদাসী বা ক্রীত অন্য পণ্যদ্রব্য ক্রেতা আবার বেচতে পারে। কিন্তু যেখানে কন্যাপণ দিয়ে বিবাহ করা হয় সেখানে মেয়েকে আবার বেচা যায় না। বস্তুত যা কেনা হয় সেটা হচ্ছে কন্যার সন্তানপ্রসবিনী ক্ষমতা। সেই কারণে দেখতে পাওয়া যায় যে, যেখানে স্ত্রী অনুর্বরা হয় সেখানে তাকে সহজে বিচ্ছেদ করা যায়।

আদিবাসীসমাজে কন্যাপণ প্রথা বহুবিস্তৃত। বস্তুত এমন কোন উপজাতি নেই যাদের মধ্যে কোন-না-কোনভাবে কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত নেই। কন্যাপণের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকম। পূর্বে কন্যাপণ নামমাত্র পাঁচ টাকা মূল্য থেকে একশত টাকা বা তার বেশী ছিল। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের ভানটুদের মধ্যে কন্যাপণের পরিমাণ ৬০ থেকে ৮০ টাকা হতো। মধ্যপ্রদেশে কোলজাতির মধ্যে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১২॥০ টাকা। বারওয়ানীর রথিয়া ভীলদের মধ্যে এর পরিমাণ ছিল ৫০ থেকে ৬০ টাকা। মাণ্ডালা ও বালাঘাটের বাইগাদের মধ্যে কন্যাপণ ছিল ৫ টাকা থেকে ৯ টাকা। কোচিনের কাদারদেব মধ্যে এক সময় কন্যাপণ বনজ পণ্যসামগ্রী দিয়ে চুকানো হতো, কিন্তু এখন তা টাকা-পয়সায় মেটানো হয়।

অনেক উপজাতির মধ্যে বরকে কন্যাপণের পরিবর্তে শ্রমদান করতে হয়। এরূপ বিবাহে বরকে নির্দিষ্টকালের জন্য শ্বশুরবাড়ীতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমিকের কাজ করতে হয়। এরূপ শ্রমদানের কাল সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। কোন কারণে যদি বিবাহ না হয় তা হলে কন্যার পিতাকে বর যে সময়ের জন্য শ্রমদান করেছে সে সময়ের নিমিত্ত প্রচলিত হারে পারিশ্রমিক

অমনোনীত বরকে প্রদান করতে হয়। কন্যাপণের বিনিময়ে শ্রম-দান যে সকল ক্ষেত্রে বলবৎ আছে সে সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে কন্যার কোন ভাই থাকে না। এসকল ক্ষেত্রে যুক্তি এই যে, যেহেতু মেয়েটি তার বাবাকে কাজে সাহায্য করতো সেহেতু তার পিতাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বরকে শ্রমদান করতে হবে। মধ্যপ্রদেশের ভীলদের মধ্যে কন্যাপণের বিনিময়ে শ্রমদানের প্রথা প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে আগেকার দিনে সাধারণত সাত বছর শ্রমদান করতে হতো। কিন্তু বর্তমানে শ্রমদানের কাল বাড়িয়ে দিয়ে নয় বছর করা হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় যে দুই তিন বছর শ্রমদানের পর যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। শ্রমদানের সময় যুবক-যুবতী সাধারণত স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করে। কিন্তু শ্রমদানের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ না হলে যুবক সাধারণত শ্বশুরালয় ত্যাগ করতে পারে না। ঝাবুয়ার পাতলিয়াদের মধ্যে শ্রমদানের নির্দিষ্ট সময় সাত বৎসর। এই নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার পর যুবক-যুবতী স্বতন্ত্র গৃহ স্থাপন করে এবং তারা যাতে স্বাধীনভাবে কৃষি-কর্ম করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সাত বৎসর উত্তীর্ণ হবার আগেই যদি তারা পালিয়ে যায় তা হলে বরকে অনুত্তীর্ণকালের জন্য আনুপাতিক হারে কন্যাপণ দিতে হয়। বিন্ধ্য ও সাতপুর পর্বতমালা অঞ্চলের অধিবাসী ভীল্‌লা উপজাতিদের মধ্যেও কন্যাপণের বিনিময়ে শ্রমদান প্রথা প্রচলিত আছে। মাণ্ডালা ও বালাঘাটের বাইগাদের মধ্যে ৫ থেকে ৯ টাকা কন্যাপণ দেবার প্রথা আছে, কিন্তু বর যদি অর্থাভাবের জন্য ওই কন্যাপণ দিতে না পারে তা হলে তাকে তিন বৎসরের জন্য শ্রমদান করতে হয়। অনুরূপ প্রথা দক্ষিণ ভারতে উল্লাটানদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে সাধারণত কন্যাপণ দিয়েই কন্যা সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু বরের যদি কন্যাপণ দেবার ক্ষমতা না থাকে তা হলে তাকে শ্রমদান করে স্ত্রী সংগ্রহ করতে হয়। এরূপ শ্রমদান এড়াবার জন্য

যুবক অনেক সময় যুবতীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কোন গোপন জায়গায় কিছুকাল বসবাস করে। এরূপ বসবাসের পর বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হয় এবং সমাজে তা স্বীকৃত হয়।

প্রেম করে বিবাহ করা কিংবা প্রণয়ীকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করা, উভয়ই আদিবাসীসমাজে প্রচলিত আছে। তবে এরূপ বিবাহের প্রতি আদিবাসীসমাজের দৃষ্টিভঙ্গী খুব কটাক্ষপূর্ণ। মধ্যপ্রদেশের ভীলূলা ও পাতলিয়া এই উভয় জাতির মধ্যেই প্রণয়ীকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করার রীতি আছে। বালাঘাট ও মাণ্ডালা অঞ্চলের বাইগাদের মধ্যে কখন কখনও কন্যা নিজেই বর পছন্দ করে তার পিতামাতার কাছে নিজের পছন্দের কথা জানায়। তা সত্ত্বেও যদি অপর পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয় তা হলে বিয়ের পর মেয়ে সাধারণত পালিয়ে যায়। উদয়পুরের পাণ্ডোদের মধ্যে যুবক-যুবতী যদি গোপনে পালিয়ে যায় এবং ওই যুবকের ঔরসে যদি যুবতী গর্ভবতী হয় তা হলে সামাজিক রীতি অনুসারে যুবককে বাধ্য করা হয় মেয়েটিকে বিয়ে করতে। মাতুরার পালিয়ানদের মধ্যে যুবক-যুবতী যদি প্রেমে পড়ে পরস্পরের সহিত যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত হয় তা হলে সমাজ সেটা মার্জনা করে নেয় এবং নিয়মানুগ অনুষ্ঠান দ্বারা তাদের বিবাহ দিয়ে দেয়। মধ্যপ্রদেশের কোলজাতির সমাজ কিন্তু এ সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী নেয়। তারা এরূপ দুর্নীতি মার্জনা করে না।

অজাচার সম্বন্ধে আদিবাসীর দৃষ্টি ভঙ্গী অত্যন্ত কঠোর। নিজ দল বা গোষ্ঠীর মেয়ের সঙ্গে যৌন-সঙ্গম অজাচার বলে গণ্য হয়। মাতৃ-কুলের ঊর্দ্ধতন চার পুরুষের মধ্যে যৌন-সঙ্গমও অজাচার বলে পরিগণিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ তো হয়-ই না। এটা হচ্ছে উত্তর ভারতের সাধারণ রীতি। দক্ষিণ ভারতে কিন্তু এমন অনেক উপজাতি আছে যাদের মধ্যে মাতৃকুলে বিবাহই হচ্ছে বাঞ্ছনীয় বিবাহ। অন্ধ্রপ্রদেশের মহবুবনগরের চেনচুদের মধ্যে মামাতো বোন

কিংবা পিসতুতো বোনকে বিবাহ করাই প্রচলিত রীতি। তবে তারা খুড়তুতো কিংবা জাঠতুতো বোনকে কখনও বিবাহ করে না। মাণ্ডালা ও বালাঘাট অঞ্চলের বাইগারা মাত্র পিসতুতো বোনকেই বিবাহ করে, মামাতো বোনকে নয়। মুরিয়াদের মধ্যে পিসতুতো ও মামাতো উভয় বোনকেই বিবাহ করার রীতি আছে। মাতুরার পালিয়ানদের মধ্যে বিবাহ হয় মামাতো বোন বা ভগ্নীর সহিত, পিসতুতো বোনের সঙ্গে কখনও নয়। কিন্তু কোচিনের কাদারদের মধ্যে পিসতুতো বোনের সঙ্গেও বিবাহের চলন আছে। ত্রিবাঙ্কুরের মুড়ুবনদের মধ্যে এরূপ বিবাহই একমাত্র রীতি। ত্রিবাঙ্কুরের মল-পুলায়ণ ও মলবেদনদের মধ্যেও এরূপ বিবাহের রীতি আছে। ত্রিবাঙ্কুরের উলুড়ণরা মাত্র পিসতুতো বোনকে বিবাহ করে কিন্তু মল-কুরুবনরা পিসতুতো বোনকে বিবাহ করে না। তারা মাত্র মামাতো বোনকেই বিবাহ করে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মামাতো-পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহের উৎপত্তি হয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। এরূপ বিবাহের দ্বারা খরচপত্র এড়ানো যায় ও সম্পত্তি অক্ষত অবস্থায় রাখা যায়। এই কারণে পিতার দিক থেকে তার বোনের মেয়ের সঙ্গে এবং মাতার দিক থেকে তার ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বিবাহে উৎসাহ দেওয়া হয়। আবার অনেকে অনুমান করেন যে কন্যা বিনিময় দ্বারা "পালটি" বিবাহের রীতি থেকেই এরূপ বিবাহের উৎপত্তি হয়েছে।

একাধিক পতির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার রীতি নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলের টোডাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ত্রিবাঙ্কুরেব মুড়ুবন, মল-পুলায়ণ ও মল-আরয়নদের মধ্যেও বহুপতিক বিবাহ একসময় প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন তা বিরল। উল্লাটানদের মধ্যেও ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতি গ্রহণ কখন কখনও দেখা যায়, যদিও ওটা তাদের মধ্যে সাধারণ রীতি নয়। হিমালয়ের সীমান্ত প্রদেশের কয়েকটি উপজাতির মধ্যেও বহুপতিক বিবাহ প্রচলিত আছে।

টোডাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহমূলক দুটি বিভাগ আছে। এ-দুটি

বিভাগের নাম হচ্ছে টারথার ও টিভালি। টারথারগণ নিজেদের টিভালি অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করে। দুটি বিভাগই হচ্ছে অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী। তার মানে টারথারদের সঙ্গে টিভালিদের কখনও বিবাহ হয় না। টারথারদের বিভাগে ১২টি ও টিভালিদের বিভাগে ৬টি গোত্র আছে। বিবাহ সব সময় নিজ গোত্রের বাহিরে হয়। টোডাদের মধ্যে মামাতো ও পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহের রীতিও প্রচলিত আছে। কিন্তু টোডাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমূলক বৈবাহিক আচরণ হচ্ছে বহুপতি গ্রহণ। টোডাদের মধ্যে যে বহুপতিক বিবাহের চলন আছে তা হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব-মূলক। তার মানে একাধিক ভ্রাতা একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে। অনেক সময় ভ্রাতৃগণ সহোদর না হয়ে দলভুক্ত ভ্রাতাও হন। টোডাদের মধ্যে সন্তানের পিতৃত্ব "পুরুস্যুৎ পুমি" নামে এক অনুষ্ঠানের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। স্ত্রীর ৭ মাস গর্ভকালে স্বামীদের মধ্যে একজন ধনুর্বান নিয়ে এই অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করে এবং সে-ই জাতসন্তানের পিতারূপে পরিচিত হয়। যতদিন না অপর কোন স্বামী অনুরূপ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করছেন ততদিন অনুষ্ঠানকারী স্বামীই সমাজে সন্তানের পিতারূপে গণ্য হয়। যেক্ষেত্রে স্বামীরা সকলে একত্রে বাস করে না বা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করে সে-ক্ষেত্রে স্ত্রী পালা করে প্রত্যেক স্বামীর সঙ্গে একমাস কাল করে বাস করে।

কাশ্মীরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত লাডাক উপত্যকার অধিবাসী লাডাকিদের মেয়েরাও বহুপতি গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণত জ্যেষ্ঠ ভাইই বিবাহ করে কিন্তু সেই বিবাহিতা স্ত্রী তার কনিষ্ঠ ভাইদেরও স্ত্রীরূপে পরিগণিত হয়। তবে যেখানে অনেকগুলি ভাই থাকে সেক্ষেত্রে ওই সম্পর্ক মাত্র তিন চার ভাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তী ভাইয়েরা কোন মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়ে লামার জীবনযাপন করে। তবে যেক্ষেত্রে কনিষ্ঠ ভাই এরূপভাবে মঠে প্রবেশ করে না সেক্ষেত্রে

সে “মাগপা” স্বামী হিসাবে কোন মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। “মাগপা” স্বামীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাকে সব সময় স্ত্রীর বশীভূত হয়ে থাকতে হয় এবং স্ত্রী যখন খুশী তখন তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে আবার নূতন “মাগপা” গ্রহণ করতে পারে। তবে দ্বিতীয় স্বামীর অবস্থাও প্রথম স্বামীরই অনুরূপ। তার সঙ্গেও স্ত্রী যে কোন সময় খুশীমত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে লেপচাজাতির মধ্যেও বহুপতিক বিবাহ সীমিতভাবে প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে এদের মধ্যে প্রথার কিছু বৈচিত্র্য আছে। সাধারণত কোন ব্যক্তি যখন চাষবাসের কাজ একা করতে অসমর্থ হয় বা তাকে অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয় তখন সে প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে কোন অবিবাহিত যুবককে তার মাঠের কাজ করবার জন্য এবং তার দাম্পত্য শয্যার অংশীদার হতে আহ্বান করে নেয়। এক্ষেত্রে কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। এই দ্বিতীয় স্বামী কখনও নিজের বাবদে স্বতন্ত্র বিবাহ করতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি হচ্ছে এই যে, স্ত্রী পর্যায়ানুক্রমে একান্তর রাত্রিতে প্রত্যেক স্বামীর সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করবে। তবে যে-কোন স্বামীর দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হউক না কেন সে সন্তান প্রথম স্বামীর ঔরসজাত বলে পরিচিত হবে। কেবল প্রথম স্বামী যদি দীর্ঘকালের জন্য বিদেশে যায় এবং তার দ্বারা সন্তান উৎপাদন অসম্ভাব্য হয় তা হলে সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামীকেই সন্তানের পিতা বলে গণ্য করা হয়।

হিমালয়ের পাদদেশের জৌনসর বেওয়া অঞ্চলের খস্ জাতীয় অধিবাসীদের মধ্যেও বহুপতি গ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। উত্তর ভারতের জাটজাতির দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে ও কেরালার নায়ারদের মধ্যে বহুপতিক বিবাহ দেখা যায়। কেরালার স্বর্ণকার বৃত্তিধারী আশরীজাতির মধ্যেও ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিক বিবাহের চলন আছে। ভারতের বাইরে তিব্বতেও বহুপতিক বিবাহ আছে। প্রাচীন

আর্যদের মধ্যেও যে বহুপতিক বিবাহের প্রথা ছিল তা তো আগেই বলা হয়েছে। এক সময় এরূপ বিবাহ ইউরোপেও প্রচলিত ছিল।

যে-সমাজে স্ত্রীলোককে জননশক্তির আধার ও আর্থিক সম্পদ হিসাবে ধরা হয় সে-সমাজ যে বাল্যবিবাহ বরদাস্ত করবে না, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণে আদিবাসীসমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই। মাত্র যারা হিন্দুসমাজের প্রভাবের আওতায় এসেছে তাদের মধ্যেই কখন কখনও বাল্যবিবাহ দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত স্ত্রী-পুরুষের যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে বিবাহ আদিবাসীসমাজে খুবই বিরল। মধ্যপ্রদেশের ভীলেদের মধ্যে ১৫ থেকে ৪০ বছর হচ্ছে মেয়েদের বিবাহের প্রচলিত বয়স। ত্রিবাঙ্কুরের উপজাতি সমূহের মধ্যে ১৫ বৎসরের পূর্বে কখনও মেয়েদের বিবাহ হয় না। প্রায় সমস্ত আদিবাসীসমাজেই মেয়েদের বিবাহের বয়স পনের-র বেশী।

বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথা আদিবাসীসমাজেও প্রচলিত আছে। মধ্যপ্রদেশের ভীলদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রায়ই ঘটে থাকে। তাদের মধ্যে যে কোন কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। তবে যেক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ স্বরূপ স্ত্রীর চরিত্রের উপর দোষারোপ করা হয়, সে-ক্ষেত্রে স্বামী গ্রামের পঞ্চায়েতকে ডেকে তার সামনে নিজের মাথার পাগড়ি থেকে একখণ্ড কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে. স্ত্রীকে দেয় এবং বলে যে, যেহেতু তার চরিত্রে তার আর আস্থা নেই সেইহেতু সে তাকে পরিহার করছে এবং ভবিষ্যতে সে তাকে ভগ্নীরূপে দেখবে। স্ত্রী ওই কাপড়ের টুকরাটি পিতৃগৃহে নিয়ে গিয়ে ঘরের চালের আড়ায় একমাস কাল ঝুলিয়ে রাখে। এর দ্বারা প্রচার করা হয় যে তার পূর্বস্বামী তাকে পরিহার করেছে এবং সে এখন দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণের অধিকারিণী। একথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় স্বামী তার দেওয়া কন্যাপণ ফেরত নিয়ে নেয়।

ভানটুদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হয় বটে

কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ খুব আনুকুল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। ওড়িষ্যার পরোজাজাতির মধ্যে স্ত্রী যদি স্বামীকে পছন্দ না করে বা তার সঙ্গে তার বনিবনা না হয় তবে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য। এদের মধ্যে স্ত্রী যদি স্বামীকে পরিহার করে তবে তাকে বাধ্য করা হয় ৫ টাকা অর্থদণ্ড দিতে আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বর্জন করে তবে তাকে মাত্র এক টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়। ত্রিবাঙ্কুরের জাতিসমূহের মধ্যেও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে। কাশ্মীরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত লাডাক উপত্যকার অধিবাসীদের মেয়েরাও খুশীমত বিবাহ বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

বিধবা বিবাহ আদিবাসীসমাজে খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে সাধারণত যে নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে—কোন বিশেষ আত্মীয়-এর সঙ্গে বিধবার বিবাহ হওয়া চাই। তবে মধ্যপ্রদেশের ভীলজাতির মধ্যে এরূপ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা আত্মীয়ের সঙ্গে . বিবাহ বাধ্যতামূলক নয়। তাদের মধ্যে বিধবার সম্মতি পেলে বিবাহপ্রার্থী ব্যক্তি ৪।৫ জন বন্ধু-বান্ধবসহ কিছু উপহার সামগ্রী ও বস্ত্র নিয়ে বিধবার বাড়ী যায় ও বিধবার ভাইয়ের স্ত্রীকে বা তার পিসিকে সাত পয়সা দক্ষিণা দেয়। এরূপক্ষেত্রে ভাইয়ের স্ত্রী বা পিসি সধবা হওয়া চাই। তারপর ভোজ ও মদ্য পান করে বিবাহ নিষ্পন্ন করা হয়। এরূপ বিবাহ সাধারণত রাত্রি-কালে হয় এবং নবপরিণীতা বিধবা- কখনও দিবালোকে তার স্বামীর গৃহে যায় না। কেননা, তাদের বিশ্বাস যে দিবালোকে স্বামীগৃহে গেলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। এরূপ বিবাহের পর বিধবার বা তার ছেলেদের প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে কোন উত্তরাধিকার থাকে না। যেক্ষেত্রে এরূপ বিবাহ দেবরের সঙ্গে হয় সেক্ষেত্রে যদি প্রথম স্বামীর ছেলে থাকে তা হলে দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তান কখনও প্রথম স্বামীর সম্পত্তি পায় না। কিন্তু যদি প্রথম স্বামীর কোন ছেলে না থাকে তা হলে দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তানরাই প্রথম

স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হয়। ভীলদের মধ্যে বিধবা বিবাহও প্রচলিত আছে; কিন্তু এদের মধ্যে হিন্দুসমাজ দ্বারা প্রভাবান্বিত উচ্চশ্রেণীর লোকেরা এর অনুমোদন করে না। বারওয়ানির পাতলি, রথিয়া ও তারভিজাতি সমূহের মধ্যেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। নীলগিরির কুরুম্বরাও বিধবা বিবাহ অনুমোদন করে। ওড়িষ্যার পরোজাদের মধ্যে বিধবাকে বাধ্যতামূলকভাবে দেবরকে বিবাহ করতে হয়। বিধবা যেক্ষেত্রে দেবরকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হয় সেক্ষেত্রে বিধবা যাকে বিবাহ করবে তাকে পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্দিষ্ট অর্থদণ্ড দেবরকে দিতে হয়। ত্রিবাঙ্কুরের মুড়ুবুনদের মধ্যেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে তবে এদের মধ্যে দেবর বা অন্য কোন স্বজনকে বিবাহ করা সম্বন্ধে কোন বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের মান্নানদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। আবার ত্রিবাঙ্কুরের কুরুম্ব পুলায়ানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও অধিকার আছে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করবার। কিন্তু উল্লটনরা মাত্র দেবরকেই বিবাহ করার অনুমতি দেয়। আসামের গারোদের মধ্যে জামাতা কর্তৃক বিধবা শ্বাশুড়ীকে বিবাহ করার রীতি আছে। আসামের বাগনি, দাফলা ও লাখেরদের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর বিধবা-বিমাতাকেই সন্তান স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। এ সমাজে পুরুষ সাধারণত অল্পবয়স্ক মেয়েকে বিবাহ করে, যাতে তার মৃত্যুর পর তার ছেলে কন্যাপণ এড়িয়ে বিমাতাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারে। মধ্যপ্রদেশের ভানটুদের মধ্যে বিধবার যদি অনেকগুলি ছেলেমেয়ে থাকে তাহলে সে বিবাহ না করে অপর পুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছা যৌনসঙ্গমে প্রবৃত্ত হতে পারে।

॥ সাত ॥

বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান

হিন্দুর দৃষ্টিতে বিবাহ-অবশ্য করণীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বিশুদ্ধিকরণেব জন্য হিন্দুদের যে দশবিধ সংস্কার আছে, বিবাহ তার মধ্যে শেষ সংস্কার। অবশ্য করণীয় ধর্মীয় আচরণ বলে বিবাহ ব্যাপারে হিন্দুদের নানা আচার-অনুষ্ঠানের অনুবর্তী হতে হয়। এ সকল আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—স্ত্রী-আচার ও পুরোহিত কর্তৃক সম্পাদিত ধর্মীয় আচার। স্ত্রী-আচার বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে যারা সধবা তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। মেয়েলীসমাজে পুরোহিত কর্তৃক ধর্মীয়-আচারের চেয়ে স্ত্রী-আচারের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস এগুলির কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে বর-কনে উভয়েরই অমঙ্গল ঘটবে। এগুলির উপর যে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার প্রভাব আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্ত্রী-আচারগুলিব উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহের পূর্বে যতরকম বাধাবিপত্তি ঘটতে পাবে সেগুলিকে প্রতিহত করা। আর পুরোহিত কর্তৃক সম্পাদিত অনুষ্ঠান-গুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে পবিত্রীকৃত করা। এসময় মৃত পুরুষদের আত্মার শান্তিকামনা করা হয় ও দেবতাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করা হয়।

হিন্দুর জীবনে বিবাহ অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষকে পাপমুক্ত করে বিশুদ্ধিকরণ করবার জন্য হিন্দুর যে দশবিধ সংস্কার আছে তার মধ্যে বিবাহ হচ্ছে শেষ বা চরম সংস্কার। বিবাহ দ্বারা স্ত্রীলোকের কুলসম্পর্কের চ্যুতি ঘটে। গোত্রদ্বারাই হিন্দুদের মধ্যে কুলসম্পর্ক সূচিত হয়। বিবাহের পর স্ত্রীলোককে

পিতৃকুলের গোত্র পরিহার করে স্বামীর কুলের গোত্র গ্রহণ করতে হয়। সেজন্য হিন্দুনারীর পক্ষে বিবাহ-জীবন চরম সন্ধিক্ষণ। এরূপ সন্ধিক্ষণে যাতে কোন বাধা-বিপত্তি না ঘটে তার উদ্দেশ্যেই আচার অনুষ্ঠান সমূহ পালিত হয়।

আচার-অনুষ্ঠানগুলির একটা সামাজিক উদ্দেশ্যও আছে। বর-কনের মধ্যে যে বিবাহ ঘটছে এবং সে বিবাহ যে অবৈধ নয় সাধারণের মধ্যে তার প্রচার ও প্রকাশ করাও এই সকল আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সেজন্য জগতের সকল জাতির মধ্যেই বিবাহ উপলক্ষে আচার-অনুষ্ঠান পালনের নিয়ম আছে, যদিও এসকল আচার-অনুষ্ঠান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন রকমের। আবার একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগত রীতি বা প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কথাই ধরুন। বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক অংশ হিসাবে, পাঞ্জাবে "ফেরে" বা যজ্ঞকুণ্ডি প্রদক্ষিণ করা প্রথা প্রচলিত আছে। উত্তর প্রদেশের বহু স্থানে কিন্তু যজ্ঞকুণ্ডি প্রদক্ষিণ করা হয় না। যেসব স্থানে বিবাহের জন্য মণ্ডপ নির্মিত হয় বা দণ্ড স্থাপিত হয় তাই প্রদক্ষিণ করা হয়। বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যায় কন্যার সিঁথিতে "সিন্দুর দান"-ই অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক প্রথা। আবার অনেক জায়গায় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কাঁটাদ্বারা আঙ্গুল থেকে রক্ত বের করে সেই রক্ত উভয়ে উভয়কে মাখিয়ে দেয়। মহারাষ্ট্র দেশে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা "প্রদক্ষিণ" প্রথা অনুসরণ করে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বর-কনের উপর মাত্র চাউল, জল বা দুধ ছিটিয়ে দেয়। দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র "তালিবন্ধন" প্রথাই বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ।

উপরে যে সমস্ত প্রথার কথা বলা হলো সেগুলো হচ্ছে মাত্র অপরিহার্য অংশ। এছাড়াও অনেক আড়ম্বরপূর্ণ ও বিশদ ধরনের আচার-অনুষ্ঠান আছে। এ সকল আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য একাধিক দিন লাগে এবং এগুলি পুরোহিত ও বাড়ীর মেয়েদের দ্বারাই

সম্পাদিত হয়। সাধারণত পুরোহিত যে অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করেন সেগুলি ধর্মীয় আচরণ আর মেয়েরা যেগুলি করে সেগুলি লোকাচার সম্পর্কিত। এই উভয়বর্গীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে নবদম্পতির সুখ, শান্তি, আয়ু ও মঙ্গল কামনা করা।

পশ্চিম বাংলার বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। সুতরাং এখানে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মাত্র এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এ সকল আচার-অনুষ্ঠান তিনদিন ব্যাপী স্থায়ী হয় এবং এতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে বর, কনে, নাপিত, পুরোহিত, বরের ও কনের বাবা ও মা, পাঁচ বা সাতজন সধবা স্ত্রীলোক ও কনের জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি। স্ত্রী-আচারের মধ্যে প্রধান হচ্ছে গায়ে হলুদ ও কলাতলা ও ছাদনাতলার আচারসমূহ, বৌভাত, ফুলশয্যা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে পিতৃপুরুষদের প্রীতির জন্য আভ্যুদয়িক ও কন্যাসম্প্রদান। ছাদনাতলার অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করে নাপিত আর সম্প্রদানের অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করে পুরোহিত। যেখানে কুশণ্ডিকা নেই সেখানে সম্প্রদানের পরই কন্যার সিঁথিতে সিন্দুরদান করা হয়। আর যেখানে কুশণ্ডিকা আছে সেখানে পরের দিন কুশণ্ডিকার পর সিন্দুরদান করা হয়। বর পরের দিন কনেকে নিয়ে নিজের বাড়ী চলে যায়। ওই দিনের রাত্রিকে কালরাত্রি বলা হয় এবং ওইদিন বর-কনে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে না। তৃতীয় দিনে কন্যাকে পাককরা অন্নস্পর্শ করতে দেওয়া হয় এবং ওই অন্ন সে আত্মীয়স্বজনের পাতে দেয়। একে বৌভাত বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকাপাকিভাবে কনেকে পরিবারভুক্ত করা, যাতে তার স্পৃষ্ট অন্ন সকলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে। সকলের শেষ অনুষ্ঠান, ফুলশয্যা। সেটা ওইদিনই রাত্রে হয়।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ছাদনাতলায় স্ত্রী-আচারের সময় কনের জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতিকে কিছু কাপড়-চোপড় উপহার দেওয়া হয়। একে জামাইবরণ বলা হয়। ১৯২৯ সালে বর্তমান লেখক

"ম্যান ইন ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে এক সময় শালীবরণ প্রথা ছিল এবং জামাইবরণ প্রথা তারই স্মৃতি-চিহ্ন বহন করছে। শালীবরণ বলতে বুঝায় একই সঙ্গে একাধিক ভগ্নীকে বিবাহ করা। এক সঙ্গে একাধিক ভগ্নীকে বিবাহ করার রীতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বিচিত্রবীর্য বিবাহ করেছিলেন অম্বিকা ও অম্বালিকাকে। নাভিও তুই যমজ ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলেন। আমাদের বাংলাদেশের ময়নামতীর গানে আমরা দেখি যে হরিশ্চন্দ্র গোপীচন্দ্রের সঙ্গে "অতুনার বিয়া দিয়া পতুনা করিল দান"। এক সঙ্গে একাধিক ভগ্নীকে বিবাহ করার প্রথা না থাকলে এরূপভাবে অপর মেয়েকে দান করার কথা উঠতেই পারে না।

আর একটি কথা এখানে বলা দরকার। পূর্ববঙ্গে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান আছে, যা পশ্চিমবঙ্গে নেই। এগুলি মঙ্গলাচরণ, অধিবাস (পশ্চিমবঙ্গের গাত্রহরিদ্রার পরিবর্ত), নিদ্রাকলস, ও দধিমঙ্গল। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান একই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের তো কথাই নেই। তা তামিলনাড়ুর আচার-অনুষ্ঠান থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে।

তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান পাঁচদিন ব্যাপী স্থায়ী হয়। তবে এর মধ্যে তুদিন হচ্ছে প্রধান। এ তুদিন হচ্ছে বিবাহের দিন ও তার পূর্বদিন। বিয়ের আগের দিন বরের দল (এর মধ্যে থাকে বরের পিতামাতা ও ভাই-বোনেরা) আসে কনের গ্রামে। সেখানে স্বতন্ত্র বাড়ীতে তাদের থাকার, আদর আপ্যায়ন ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে তারা নিকটস্থ কোন মন্দিরে গিয়ে দেবতার অর্চনা করে। তারপর বরকে একটি সজ্জিত যানে করে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। একে বলা হয় "যানবাসন" বা "মপিপলই আঝাইপপু" বা বরানুগমন। বিবাহ মণ্ডপে সমবেত লোকের সামনে ঘোষণা করা হয় যে পরদিন ওই বরের সঙ্গে অমুকের

মেয়ের বিয়ে হবে। একে বলা হয় "নিচয় থারথম" এবং এই অনুষ্ঠানের সময় বর-কনেকে এক সঙ্গে বসান হয়। এরপর ভোজ উৎসব হয়।

বাংলাদেশে বিবাহ হয় রাত্রে আর তামিলনাড়ুতে বিবাহ হয় দিনের বেলায় মধ্যাহ্নের পূর্বে। বিবাহের দিন প্রাতের প্রথম অনুষ্ঠান হচ্ছে "ব্রতম"। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে নবদম্পতির সুখশান্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করা এবং সমস্ত বাধাবিপত্তি ও অমঙ্গল প্রতিহত করা। এই সময় কতগুলি কপটভাবের ভান করা হয়। বর কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দেয়, তার জন্য একটি যোগ্যা পাত্রীর অন্বেষণে আর নিজে একটি পুটুলীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড়, একটি ছাতা ও লাঠি নিয়ে "কাশীযাত্রা" করে। এই কপটভাবের দ্বারা সে দেখাতে চায় যে উপযুক্ত কনে না পাওয়ার দরুন সে দেশত্যাগী হয়ে কাশী যাচ্ছে। এই সময় পথে মেয়ের বাপ তার গতিরোধ করে তাকে বলে যে তার একটি উপযুক্ত মেয়ে আছে, মেয়েটিকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবে।

তারপর বর-কনেকে একটি ঝোলায় বসান হয় এবং মেয়েরা স্ত্রী-আচার ঘটিত অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করে।

এর পর মূল অনুষ্ঠানসমূহ আরম্ভ হয়। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই বিবাহ অনুষ্ঠানের মূল অংশ হচ্ছে "তালিবন্ধন"। তালির অপর নাম হচ্ছে "থিরুমঙ্গলম্"। বিবাহের শুভ মুহূর্তে বর কর্তৃক কনের গলায় থিরুমঙ্গলম্ বেঁধে দেওয়া হয়। এটা আমাদের বাংলাদেশের "সিন্দুর দানের" পরিবর্ত মাত্র। থিরুমঙ্গলম্ জিনিসটা কি তা এখানে একটু বিশদভাবে বলা দরকার। থিরুমঙ্গলম্ হচ্ছে সোনার তৈরী লকেটের মত একটা জিনিস যার উপর শিবলিঙ্গ বা কোন ফুল খোদিত থাকে। বিশেষ আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের সঙ্গে এই জিনিসটা স্বর্ণকারকে তৈরী করতে দেওয়া হয়। একখানা আল্পনা দেওয়া পিঁড়ির উপর স্বর্ণকারকে পূর্বদিকে মুখ করিয়ে বসান হয় এবং তাকে

থিরুমঙ্গলম্ তৈরী করবার জন্য সোনা ও একটি থালায় করে পান, সুপারী, আতপ চাউল ও কিছু দক্ষিণা সমেত একটি "সিধে" দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ভারতে সধবা স্ত্রীলোককে "সুমঙ্গলী" বলা হয়। আমাদের বাংলাদেশে সিঁথির সিন্দুর ও হাতের "নোয়া" যেমন সধবা স্ত্রীলোকের চিহ্ন, দক্ষিণ ভারতে তেমনি থিরুমঙ্গলম্ "সুমঙ্গলী" স্ত্রীলোকের চিহ্ন।

দক্ষিণ ভারতে বিবাহের শুভলগ্নের সময় বর ও কনেকে পিঁড়ির উপর বসান হয়। তারপর পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে হোম দেয়। এই সময় বর একখানা মুল্যাবান শাড়ী সমেত থিরুমঙ্গলম্টি কনের হাতে দেয়। বরকেও ওই সময় একখানা মূল্যবান বস্ত্র দেওয়া হয়। ওই বস্ত্রকে "অঙ্গবস্ত্র" বলা হয়। বর-কনে এই সময় ওই বস্ত্র ও শাড়ী পরে। থিরুমঙ্গলম্টিকে হলুদসিক্ত সুতোয় বেধে দেবতাদের কাছে উৎসর্গের জন্য দেওয়া হয়। উৎসর্গীকৃত হবার পর থিরুমঙ্গলম্টিকে একটি থালার উপর রেখে সমবেত লোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য। তারপর একটা "জোয়াল" পূজা করা হয় ও সেটা বর-কনের কাঁধের উপর স্থাপন করা হয়। এর রূপকার্থ হচ্ছে, বর-কনে উভয়ে যেন জোয়াল-গ্রথিত বলদের ন্যায় যুক্তভাবে জীবনের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হয়।

তারপর কনেকে তার বাপের কোলে বসানো হয় এবং মন্ত্র উচ্চারণ ও ঢাকঢোলের বাজনার মধ্য দিয়ে বর-কনের গলায় থিরুমঙ্গলম্টা বেঁধে দেওয়া হয়। বর মাত্র একটা গেরো দেয়, বাকী গেরো দেয় বরের বোনেরা। এর পরই "পাণিগ্রহণ" ও সপ্তপদীগমন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বর-কনেকে হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করান হয় এবং কনের একটি পা পাথরের উপর রাখতে বলা হয়, যাতে স্বামীর প্রতি তার ভক্তি ও অনুরাগ পাথরের মত দৃঢ় হয়।

রাত্রে "শেষহোমম্" সম্পাদন করে বর-কনেকে আকাশে ধ্রুব ও

অরুন্ধতী নক্ষত্র দুটির প্রতি তাকাতে বলা হয়। তারপর "আশীর্বাদ" সম্পাদন করে বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। বর পরের দিন কনেকে নিয়ে তার নিজের বাড়ী চলে যায়। একে বলা হয় "গৃহপ্রবেশম্"। বরের বাড়ী আর কোন অনুষ্ঠান হয় না।

মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে বিবাহ একদিনেই শেষ হয়ে যায়। হরিয়ানায় কিন্তু দুদিন লাগে। মহারাষ্ট্রে মেয়ে পছন্দ হবার পর সকলকে সাক্ষী রেখে যৌতুকের জন্য 'ইয়াদী' নামে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। নগদ টাকা, অলঙ্কার প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে যা কিছু যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হবে তা সব এই চুক্তিপত্রে লেখা থাকে। ইয়াদী-পত্র স্বাক্ষরিত হবার পর মেয়ের বাবা পাত্র সমেত পাত্র পক্ষের সকলকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করেন ও তাঁর সমক্ষে মেয়ের বাবা ছেলেকে ও ছেলের বাবা মেয়েকে "কুঙ্কুম-তিলক" পরিয়ে দেন। এরপর ছেলের বাবা একটা জরি দিয়ে তৈরী ঠোঙায় করে মেয়ের হাতে কিছু মিষ্টি দেয়। এই অনুষ্ঠানকে "সাখবপুড়া" বলা হয়। ইহাই বিবাহের পাকা দেখা। বিয়ের আগের দিন সকালে মেয়ের বাড়ীতে হয় "বাঙ্‌নিশ্চয়" অনুষ্ঠান আর সন্ধ্যাবেলা ছেলের বাড়ীতে হয় "সীমন্ত পূজন" অনুষ্ঠান। বিয়ের দিন সকালে বর-কনে উভয়ের বাড়ীতেই অনুষ্ঠিত হয় "হলদী" বা গায়ে হলুদ। তারপর মেয়েরা দেওয়ালে চন্দ্র-সূর্য ও নানারকম মাঙ্গলিক চিহ্নের নকশা আঁকেন ও তার সামনে একটা উঁচু পিঁড়িতে একটি লক্ষ্মীমূর্তি স্থাপন করেন। একে বলা হয় "দেবক"। মেয়েকে এই লক্ষ্মীমূর্তির সামনে বসিয়ে রাখা হয়।

বর এলে মেয়ের বাবা ও মা জল ও দুধ দিয়ে বরের পা ধুইয়ে দেয়। তারপর যেখানে বিয়ে হবে সেখানে বরকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সামনা-সামনি দুখানা পিঁড়ি থাকে। বরকে একটা পিঁড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। দুজন মহিলা একখানা কাপড়ের দুকোণ ধরে বরের সামনেটা আড়াল করে দেয়। একে "অন্তরপট"

বলা হয়। তারপর কনের মামা কনেকে নিয়ে এসে তাকে অপর পিঁড়িতে দাঁড় করান। এরপর আটবার "মঙ্গলাষ্টক" মন্ত্র পাঠ করা হয়। "মঙ্গলাষ্টক" শেষ হলে বর-কনের মধ্যবর্তী কাপড়টা সরিয়ে দেওয়া হয়। তখন কনে বরের গলায় মালা পরিয়ে দেয় আর বর সোনার পুঁতি দিয়ে তৈরী "মঙ্গলসূত্রম্" কণ্ঠী কনের গলায় পরিয়ে দেয়। তারপর বর-কনে পাশাপাশি বসে ও মেয়ের বাবা কন্যাদান করে। মহারাষ্ট্রের কন্যাদান অনুষ্ঠানটা একটু বিচিত্র। বরের হাতের উপর কনের হাত রেখে কনের বাবা মেয়ের হাতে একটু জল ঢেলে দেন। মেয়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল বরের হাতে পড়লেই 'কন্যাদান' অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এরপর লাজহোম, অগ্নি প্রদক্ষিণ, ঘৃতাহুতি ও সপ্তপদীগমন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর আসে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়ান-দাওয়ানর ব্যাপার। এরপরই বর-কনে বিদায় নেয়।

বরের বাড়ীর সদর দরজায় এক কুনকে চাল রাখা হয়। কনে এসে প্রবেশ করবার সময় পা দিয়ে সেই চালের কুনকে ঘরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বর এই সময় কনের নূতন নামকরণ করে। মহারাষ্ট্র দেশে মেয়েদের বিয়ের পর বাপের বাড়ীর দেওয়া নাম পরিহার করতে হয়। বিয়ের পর স্বামী যে নূতন নাম দেন সেই নামেই সে পরিচিতা হয়। সেই রাত্রেই বর-কন্যার ফুলশয্যা হয়।

গুজরাটে বরপক্ষ যখন প্রথম মেয়ে দেখতে আসে তখন সেই সঙ্গে ছেলে নিজেও আসে। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে কথাবার্তা শেষ হলে এবং মেয়ে পছন্দ হলে তখন সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মাত্র ছেলে ও মেয়ে সেই ঘরে থাকে ও তারা নিজেদের মধ্যে ইচ্ছামত আলাপ করে। তারপর বরপক্ষকে নানারকম মিষ্টান্ন খাওয়ান হয়। একে "মিঠাজিভ" বলা হয়।

তারপর একদিন যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম "সওয়া রূপিয়া

লিয়া।” এই অনুষ্ঠানে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের সকলেই শ্রীনাথজী ঠাকুরের নামে সওয়া রূপিয়া নিবেদন করে। পরে ওই টাকা শ্রীনাথজীর মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর হয় “চুনরি প্রসঙ্গ”। এই উপলক্ষে ছেলের মা একখানা সবুজ রঙের জরির নক্‌শাদার শাড়ী, অলঙ্কার, মিষ্টান্ন, নারিকেল প্রভৃতি নিয়ে মেয়ের বাড়ী আসে ও তাকে কুঙ্কুমের তিলক পরিয়ে সেগুলি তার হাতে দেয়। এছাড়া মেয়ের নাকে একটা নাকছাবি ও পায়ে রূপার আংটি পরিয়ে দেয়। এরপর “নারিকেল বদলী” অনুষ্ঠানের জন্য মেয়েপক্ষের মহিলারা ছেলের বাড়ী যায় ও বরকে কুঙ্কুমের তিলক পরিয়ে তাকে আশীর্বাদ করে। তারপর মেয়ের ভাবী ননদ বা জা এসে মেয়েকে ছেলের বাড়ী নিয়ে যায়। সেখানে মেয়ের পায়ে কুঙ্কুম লাগিয়ে একখানা শাদা কাপড়ের উপর তু’পায়ের ছাপ নেওয়া হয়। ছেলের মা তাকে একখানা নূতন শাড়ী দেন ও আদর করে তাকে সরবৎ খাওয়ান।

গুজরাটে বিয়ে সাধারণত তুপুরবেলা হয়। সবুজ বা লাল রঙের শাড়ী পড়ে বিয়ে হয়।

বর বিয়ে করতে এলে মহিলারা বরের প্রশংসায় গান করে। বর এলে কনে বরের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। বরও কনের গলায় মালা পরায়। তারপর কনের মা বরকে আরতি করেন ও জলপূর্ণ কলসী নিয়ে বরণ করেন। তারপর পুরোহিত যজ্ঞাগ্নি জ্বেলে মন্ত্রপাঠ করেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হলে মেয়ের বোন বা ‘ভাবী’ মেয়েকে নিয়ে বিবাহমণ্ডপে আসে। একটুক্‌রা হলুদ-কাপড় মেয়ের শাড়ীর আঁচলের সঙ্গে বেঁধে বরের কাঁধের উপর স্থাপন করা হয়। তারপর বর-কনে চারবার হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করে। একে “ফেরা” বলা হয়। তারপর বর-কনেকে দেবতার মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর খাওয়ান দাওয়ান হয়। খাওয়ান-দাওয়ান শেষ হলে সেই রাত্রেই বর-কনে বিদায় নেয়। বর-কনে বাড়ী পৌঁছলে বরের মা তাদের আরতি করে

ঘরে তোলেন। তারপর বর-কনেকে দিয়ে গণেশ পূজা করান হয়। সেই রাত্রেই ফুলশয্যা হয়।

হরিয়ানাতেও বিবাহে হিন্দুর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মাল্যদান, হবন বা হোম, কাঠবন্ধন, কন্যাদান, অগ্নিপ্রদক্ষিণ, লাজবর্ষণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তবে অগ্নিপ্রদক্ষিণ শেষ হলে বরের বোনেরা কনেকে মালা পরান ও মিষ্টিমুখ করান। এই অনুষ্ঠানকে "চৌকা" বলা হয়। এর জন্য মেয়ের মা বরের বোনেদের শাড়ী দেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি প্রথা হরিয়ানায় দৃষ্ট হয়। যেমন, বিবাহ-মণ্ডপে কলাগাছ বসান, রাত্রিকালে বিবাহ, বিয়ের পরের দিন বর-কনের বিদায় ইত্যাদি। কনে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছলে শাশুড়ী সদর দরজায় এসে বর-কনেকে দুধভরা ঘটি দিয়ে আশীর্বাদ করেন। পশ্চিম বঙ্গের মত কনের কোলে একটি ছোট ছেলেকেও বসিয়ে দেওয়া হয়। সেই রাত্রেই "সোহাগ-রাত" বা ফুলশয্যা হয়।

আদিবাসীসমাজেও বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিবাহবিষয়ক আচার-অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তবে হিন্দুদের তুলনায় আদিবাসীসমাজের আচার-অনুষ্ঠান অনেক পরিমাণে সরল, সংক্ষিপ্ত ও আড়ম্বরহীন। বিবাহ সাধারণত একদিনেই সমাপ্ত হয়। তবে কোন উপজাতিসমাজে এর জন্য একাধিক দিনও লাগে। যেমন, মধ্যপ্রদেশের বারগুণ্ডাদের মধ্যে বিবাহ তিনদিনে সমাপ্ত হয়। আদিবাসীসমাজে বিবাহ সাধারণত কোন জ্যেষ্ঠ আত্মীয় বা আত্মীয়া বা পঞ্চায়েত বা বাইগা (ওঝা) দ্বারা সম্পাদিত হয়। তবে যে সকল উপজাতি হিন্দুভাবাপন্ন হয়েছে (যেমন মধ্যপ্রদেশের পাতলিয়া ভীলজাতি বা যশপুরের গোণ্ডজাতি) তারা ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারাই বিবাহ সম্পাদন করায়। আবার উপজাতিদের মধ্যে কোন কোন জায়গায় বিবাহ অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় স্বরূপ দেবার জন্য দেবদেবীরও পূজা করা হয়। আবার কোন কোন জায়গায় অনুষ্ঠানের কোন বালাই নেই ; মাত্র মালাবদল, কী তালিবন্ধন, কী কন্যার সিঁথিতে

সিন্দুর ঘর্ষণ, কী কন্যাকে লুণ্ঠন করবার নাটকীয় অনুকরণ করেই বিবাহ করা হয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানের যে বৈচিত্র্য আছে তা নীচের দৃষ্টান্তগুলি থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে।

ভীলদের মধ্যে বর তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়াদেব নিয়ে কনের বাড়ী যায়। সেখানে বরের বাবা কনের পিতামাতাকে কিছু অর্থদান করে। তারপর বর-কনেকে এক সঙ্গে বসান হয় এবং দলের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ তাদের ঘিরে নাচগান করতে থাকে। এরপর ভোজ ও মদ্যপান চলে এবং তার সঙ্গেই বিবাহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। গোণ্ডদের মধ্যে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী উভয়দলই নিজ নিজ বাড়ী থেকে রওনা হয় এবং মধ্যপথে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। এখানে উভয় দলের মধ্যে দানসামগ্রীর আদান-প্রদান ঘটে। তারপর বর-কনে জল ভর্তি একটি মঙ্গলঘট সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারাই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। এক্ষেত্রেও দলবেঁধে নাচগান ও মদ্যপান করে উৎসব শেষ করা হয়। মারিয়াদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় বরের বাড়ীতে। মেয়ের বাপ-মা কনেকে সেখানে নিয়ে আসে। কোন দেবদেবীর পূজা হয় না কিন্তু একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। তারপর দলের সকলে মদ্যপান করে। উদয়পুরের পাণ্ডাদের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে একটি দণ্ড স্থাপন করা হয় এবং সাতবার সেই দণ্ড প্রদক্ষিণ করে বিবাহকর্ম শেষ করা হয়। উদয়পুরের সাঁওতালদের মধ্যে বিবাহের অনুষ্ঠান খুবই সরল এবং দুইজন কুমারী মেয়ে এই অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব করে। ওরাঁওদের মধ্যে যারা খ্রীশ্চান তারা প্রথমে গির্জায় গিয়ে বিয়ে করে কিন্তু তারপর আবার উপজাতিসমাজের আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করে। নীলগিরি পাহাড়ের পালিয়ানদের মধ্যে বরের বোন কনের গলায় তালি বেঁধে দেয় এবং সেই সময় নিকটস্থ কোন বাড়ী থেকে কোন লোক চেঁচিয়ে ঘোষণা করে যে অমুকের বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছে। তখন সংলগ্ন কোন বাড়ী থেকে কোন

প্রবীণ ব্যক্তি তার উত্তর দিয়ে বলে "হ্যা, এ বিয়েতে আমাদের সকলের সম্মতি আছে।" মাতুরার পালিয়ানদের মধ্যে অনুষ্ঠান আরও সরল। এদের মধ্যে রীতি হচ্ছে, বর-কনে পরস্পরের গলায় কালরং-এর পুঁতির একটা মালা বেঁধে দেয় এবং কনেকে বর একখানা কাপড় দেয়। ওড়িষ্যার পরোজাদের মধ্যে লুণ্ঠনের নাটকীয় অনুকরণ করা হয়। তাদের মধ্যে বিবাহের নির্দিষ্টদিনে বর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কনের বাড়ীর কাছে গিয়ে লুকিয়ে থাকে এবং কনে যখন সেই পথে একা আসে তখন সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তাকে লুণ্ঠন করে নিজের বাড়ী নিয়ে যায়। তারপর কনের বাবা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মেয়েকে উদ্ধার করতে আসে। এরপর এক কপট যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধ করে যখন সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তারা বরের বাড়ী গিয়ে মদ্যপান ও ভোজে যোগ দেয়। ত্রিবাঙ্কুরের মুড়ুবানদের মধ্যেও এরূপ লুণ্ঠন করে বিয়ে করার রীতি আছে। মুড়ুবানদের মধ্যে বিয়ের একটা অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হচ্ছে বর, কনেকে একটা চিরুনী দেয় এবং কনে সেই চিরুনীটা চিরদিন মাথার পিছন দিকে খোপায় রাখে। মান্নান্‌দের মধ্যে রীতি হচ্ছে বরের বোন কর্তৃক কনের গলায় তালি বেঁধে দেওয়া। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ উপজাতিদের মধ্যে বিবাহ তালিবন্ধন দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান সাধারণত কনের বাড়ীতেই হয়। কিন্তু কোথাও কোথাও বরের বাড়ীতে হবার প্রথাও আছে। মাণ্ডালা ও বালাঘাটের বাইগাদের মধ্যে বিবাহ স্থির হয়ে গেলেই বরের বাবা দু বোতল মদ এনে কনের বাবাকে উপহার দেয়। এই মদের কিছু পরিমাণ বুড়া দেওতার কাছে উৎসর্গ করা হয় আর বাকিটা সমবেত সকলের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে "সাগাই" বলা হয়। একপক্ষকাল পরে বরের দল চার বোতল মদ নিয়ে আবার কনের বাড়ী আসে। কনের বাপ-মা তাদের ভোজ দিয়ে আপ্যায়ন করে এবং বিয়ের দিন স্থির করে। এই অনুষ্ঠানকে "বরোখি" বলা হয়। এরপর কনের বাবাকে দশদিনের সময় দেওয়া

হয় বিয়ের আয়োজন করবার জন্য। দশদিন পরে বরের দল কনের বাড়ী আসে। কনের বাবা তাদের ভোজ দিয়ে আপ্যায়ন করে এবং সমস্তরাত্রি নাচগান চলতে থাকে। মগুপানও রীতিমত হয়। পরের দিন অপরাহ্ণে "ভানওয়ার" অনুষ্ঠিত হয়। এরজন্য একটা মণ্ডপ তৈরী করা হয় এবং মাটিতে একটা দণ্ড পোঁতা হয়। কনেকে নিয়ে বর তিনবার এই দণ্ড প্রদক্ষিণ করে। তারপর বর-কনে ও কনের বাপ-মা বরের বাড়ীর দিকে রওনা হয়। বরের বাড়ীতেও অনুরূপ একটি মণ্ডপ তৈরী করা থাকে এবং সেখানেও একটা দণ্ড পোঁতা থাকে। কনেকে নিয়ে বর সাতবার ওই দণ্ড প্রদক্ষিণ করে। তারপর ভোজ ও মগুপান করে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। মধ্য-প্রদেশের অপরাপর উপজাতিদের মধ্যেও অনুরূপ অনুষ্ঠানসমূহ প্রচলিত আছে। তবে ওঁরাও, কোরবা প্রভৃতি জাতিসমূহ মণ্ডপের পাশে একটি জাঁতা স্থাপন করে এবং তার উপর পাঁচটি চালের স্তূপ রাখে। প্রতি স্তূপের উপর যথাক্রমে একটি তামার পয়সা, হলুদ, সুপারি প্রভৃতি রাখা হয়। কনে একখানা কুলো হাতে নিয়ে বরের সামনে এসে দাঁড়ায়। কনের ছোট ভাই কিছু খই ওই কুলোয় দেয় আর বর পিছন দিক থেকে কনের হাত ধরে। তারপর তারা ওই কুলোর সমস্ত খই ছড়াতে ছড়াতে পাঁচবার মণ্ডপটি প্রদক্ষিণ করে। প্রতিবার প্রদক্ষিণ করবার সময় কনের পা দিয়ে বর জাঁতার উপর স্থাপিত চালের স্তূপগুলি মাটিতে ফেলিয়ে দেয়। তারপর সিন্দুরদান অনুষ্ঠিত হয়। অনেক গ্রামে এ সম্পর্কে একটা অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সেটা হচ্ছে, কনের বসা অবস্থায় তার ডানপায়ের উপর বর বাঁ পায়ে দাঁড়ায়-এবং একটা পাতা থেকে তেল নিয়ে কনের মাথায় মাখিয়ে দেয়।

মহবুবনগরের চেংচুদের মধ্যে বরের দল কিছু মহুয়া ফুল, মদ ও একজন ঢুলিকে নিয়ে কনের বাড়ীর দিকে যাত্রা করে। কনের বাড়ীর কাছাকাছি এলে ঢাকী ঢাক বাজাতে আরম্ভ করে। তারপর

কন্যাপক্ষের লোকেরা বরের দলকে অভ্যর্থনা করতে থাকে। অভ্যর্থনা করে তাদের নিয়ে যাবার পর নাচ, গান, ভোজ ও মদ্যপান চলে। পরের দিন সকালে সকলে একত্রিত হয়ে আবার ভোজ ও মদ্যপান করে। বর তারপর কনেকে একখানা শাড়ী, একখানা চেলি ও একটা পুঁতির মালা দেয়। কনে পুঁতির মালাটি নিজের গলায় পরে। এর পর সমাগত অতিথিরা ও কনের বাবা বরকে বলে, সে যেন স্ত্রীকে সুখে রাখে ও তার প্রতি যত্নবান হয়। এখানেই বিবাহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিবাহ উপলক্ষে উদয়পুরের নাগাসিয়াদের মধ্যে এক বিচিত্র অনুষ্ঠান আছে। বর আনুষ্ঠানিকভাবে নদীতে স্নান করবার পর তীরধনুক নিয়ে এক কল্পিত মৃগের দিকে সাতবার ধাবমান হয়। সাতবারের পর তার ভগ্নীপতি এসে তীরটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। বর তাকে ধরবার জন্য পিছনে পিছনে ছুটে। যদি তাকে ধরতে না পারে তা হলে এক আনা অর্থদণ্ড দিতে হয়। এখানেই বিবাহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তবে আনুষ্ঠানিক স্নানের পূর্বে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় সেগুলো উপজাতি ও হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠানের মিশ্রণে রচিত।

যশপুরের রাউতিয়াদের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে "দুলহা দেও"-এর পূজা করা হয়। কনেকে একটা ডুলি করে নিয়ে আসা হয়। কালো রং-এর ছোপবিশিষ্ট লাল রং-এর একটা ছাগল আনা হয় এবং এক জায়গায় রাশিকৃত চাউল রেখে তাকে খেতে দেওয়া হয়। তারপর সেই ছাগলটিকে বাড়ীর বাইরে এক কোণে কাটা হয়। ছাগলের রক্ত বাড়ীর ভিতরে এনে চাউলের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয় ও তিনবার "দুলহা দেও"-এর কাছে প্রার্থনা দ্বারা নবদম্পতির সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনা করা হয়। তারপর রক্ত ছিটানো চাউলগুলি নদীতে ফেলে দেওয়া হয় এবং ছাগ-মাংস রান্না করে পরিবারের সকলে ও অতিথিরা খায়। এদের মধ্যে অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানগুলি প্রতিবেশী

অন্য উপজাতিদের মতই, কেবল দ্বিতীয় দিনে বরকে একটি আমগাছের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়ে বরকে ওই আগুনের উপর আটা, ঘি, গুড় ইত্যাদি ছিটিয়ে দিতে বলা হয়। পরে গাছটির চারদিকে সুতা জড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ওর একটা ডাল এনে কনের বাড়ীর বিবাহমণ্ডপে পুঁতে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে বিবাহের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান নাপিত কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। বর-কনের মুখে ও গলায় সিন্দূর মাখিয়ে দেওয়া হয় এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে অন্ন বিতরণ করা হয়। তারপর একটা আমডালের সাহায্যে বর-কনের উপর শান্তিজল ছিটিয়ে দেওয়া হয় ও তাদের উভয়ের কাপড় নিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়। রাউতিয়ারা বলে যে তাদের মধ্যে এ সকল আচার-অনুষ্ঠান আদিমকাল থেকে অনুসৃত হয়ে এসেছে।

মধ্যভারতের কোলজাতির মধ্যে বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানসমূহ উপজাতি ও হিন্দু—এই উভয় সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে। এদের মধ্যে বাগ্‌দান ও বিবাহের লগ্ন স্থির হয়ে যাবার পর, বর-কনে উভয়ের বাড়ীতে "মঙ্গর মাটি" অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়। বিবাহ উপলক্ষে যে সমস্ত চুলা (উনুন) তৈরী করা হয় তার জন্য মাটি সংগ্রহ করাই "মঙ্গর মাটি" অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। "মঙ্গর মাটি" অনুষ্ঠান বর ও কনের বাটিতে একই রাত্রে সম্পাদিত হয়। মাত্র মেয়েরাই এই পবিত্র মাটি সংগ্রহ করে। পাঁচ-সাতটি চুলা তৈরী করা যেতে পারে এরূপ পরিমাণ মাটি সংগ্রহ করা হয় এবং সেই রাত্রেই চুলাগুলো তৈরী করা হয়। পরের দিন চুলা সমূহে "লাওয়া" তৈরী করা হয়। লাওয়া হচ্ছে খই ও জোয়ার-এর মিশ্রণে প্রস্তুত একটা পদার্থ যা কোলজাতির মধ্যে বিবাহের এক অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। লাওয়া তৈরী করবার পর তা একটা নতুন হাঁড়িতে রাখা হয়। এই হাঁড়ির গায়ে মেয়েছেলের চিত্র অঙ্কিত থাকে। অনেকসময় ওই হাঁড়ির মধ্যে আতপ চাউল, হলুদ এবং দুটি পয়সা রাখা হয়। বরের বাড়ী থে

লাওয়া তৈরী করা হয়, তা বরযাত্রীরা সঙ্গে করে কনের বাড়ী নিয়ে আসে এবং সেখানে কনের বাড়ীতে তৈরী লাওয়ার সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়।

বিবাহ উপলক্ষে কনের বাড়ীর উঠানে একটা মণ্ডপ তৈরী করা হয়। নির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুযায়ী এবং বিশেষ গাছের কাঠ দিয়ে এই মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়। মণ্ডপটিকে "মাড়ওয়া" বলা হয়। এই মাড়ওয়ার মধ্যেই বিবাহ সম্পাদিত হয়। এদের মধ্যে বিবাহ তিন অংশে তিন দিনে নিষ্পন্ন হয়। প্রথম দিনের সন্ধ্যায় বরাত বা বরযাত্রীর দল কনের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। কনের বাড়ীর সমস্ত মেয়েরা মশাল হাতে করে গ্রামের সীমান্তে গিয়ে বরযাত্রীদের স্বাগত জানায়। যারা স্বাগত জানাতে যায় তাদের নেত্রী হয়ে যায় কনের সহোদরা বা অন্য কোন বোন। বিবাহ হয় তার পরের দিন রাত্রে। বিবাহ সম্পাদিত হয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা। কিন্তু আগে থেকে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে পুরোহিতের সাহায্য নেওয়া হবে না, তা হলে বিবাহ সম্পাদন করে কনের পিসে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিবাহ মণ্ডপের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়। বর কনের সিঁথিতে সিন্দূর পরিয়ে দেয়। তারপর কনের বোন বর-কনের কাপড়ের কোণ নিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। এরপর বর-কনে পবিত্র দণ্ডের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। কনের বয়স যদি খুব কম হয় তা হলে মাত্র পাঁচবার প্রদক্ষিণ করা হয় আর কনে যদি "সেয়ানা" হয় তা হলে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। প্রদক্ষিণের পর বর কনেকে অনুসরণ করে ও ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। সেখানে একটি প্রদীপ জ্বলে এবং কনের মা বরকে ফুঁ দিয়ে সেই প্রদীপটি নিবিয়ে দিতে বলে। কিন্তু কনের মায়ের কাছ থেকে কিছু দক্ষিণা না পাওয়া পর্যন্ত বর এক কথায় এ কাজ করে না। তারপর তাদের গাঁটছড়া খুলে দেওয়া হয় এবং কনের শাড়ীর এক অংশ তার মুখের সামনে ধরে বরকে শুভদৃষ্টি করতে বলা হয়। পরের দিন "বিদা" বা বরের বাড়ী ফিরে যাওয়ার পালা পড়ে। কন্যাপক্ষ

বরপক্ষের সঙ্গে গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে তাদের বিদায় দেয়। কোলেদের মধ্যে কনে কিন্তু বরের সঙ্গে যায় না। সে বাপের বাড়ীতেই থেকে যায়। কনের যখন যৌবন প্রাপ্তি ঘটে বর তখন "গৌণা" অনুষ্ঠান সম্পাদন করে কনেকে নিজের বাড়ী নিয়ে যায়। যেক্ষেত্রে বিবাহের সময় মাত্র পাঁচবার দণ্ড প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল সেক্ষেত্রে বাকী দুবার এই সময় প্রদক্ষিণ করতে হয়। কোলেদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে "রওনা" অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। রওনা আর কিছুই নয়, বর কর্তৃক কনেকে নিজের বাড়ী নিয়ে যাওয়া মাত্র।

কোলেদের মধ্যে আর এক রকম বিবাহেরও প্রচলন আছে। একে বলা হয় "ভাগল" বা কনেকে গোপনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। এ ক্ষেত্রে তারা প্রথমে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হয়। বর সেখানে কনের হাতে দশগাছা কালো রং-এর চুড়ি পরিয়ে দেয় ও তার সিঁথিতে সিন্দুর ঘষে দেয়। তারপর থেকে তাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক অর্সায়। অনেক সময় এর সামাজিক স্বীকৃতির জন্য পঞ্চায়েতকে ভোজ দেওয়া হয়।

॥ আট ॥

বিবাহ-পূর্ব যৌন সংসর্গ

হিন্দুদের মধ্যে বিবাহের পূর্বে যৌন সংসর্গ কখনও বরদাস্ত করা হয়না। আগেকার দিনে এরূপ ঘটনা ঘটলে বাপ-মায়ের জাত যেতো এবং সে মেয়ের কখনও বিয়ে হতো না। এটাই ছিল হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি। আজকালকার দুর্নীতির দিনে বাপ-মাকে আর এরূপ দণ্ডভোগ করতে হয় না এবং মেয়েকেও অবিবাহিতা থাকতে হয় না।

আদিবাসীসমাজের কথা অবশ্য ভিন্ন। আদিবাসীসমাজের অনেকস্থলে বিবাহের পূর্বে ছেলেমেয়েদের পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। এর জন্য অনেক উপজাতির মধ্যে ছেলেমেয়েদের রাত্রিযাপনের জন্য "ঘুমঘর" আছে। ঘুমঘরগুলি সাধারণত দুরকমের হয়। ছেলে ও মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র ঘুমঘর ও ছেলেমেয়েদের একত্রে রাত্রিযাপনের যৌথ ঘুমঘর। স্বতন্ত্র ঘুমঘরগুলি নানাবিধ দক্ষতালাভের প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। আর যৌথ ঘুমঘরগুলি তরুণীদের যৌনচর্চার দক্ষতা অর্জনের সংস্থা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডদের মধ্যে প্রচলিত ঘুমঘরগুলিকে "ঘোটুল" বলা হয়। মুণ্ডা ও বিরহোররা এগুলিকে "গিতিওড়া" বলে। আসামের গাড়োরা এগুলিকে "লোকপাণ্ডে" বলে। নাগাদের মধ্যে এগুলিকে বলা হয় "মোরাং"। যৌথ ঘুমঘরগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে মুরিয়াদের মধ্যে প্রচলিত ঘোটুল। ঘুমঘর পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের সাঁওতালদের মধ্যে, বিহারের ওরাঁওদের মধ্যে, ওড়িষ্যার খরিয়া, জুয়াঙ, খণ্ড ও ভুঁইয়াদের মধ্যে এবং ত্রিবাঙ্কুরের মুড়ুবন, মান্নান ও পালিয়ানদের মধ্যেও বিদ্যমান

আছে। অনেক জায়গায় এগুলি মাত্র বিলীয়মান প্রথার চিহ্নমাত্র বহন করছে।

মুরিয়াদের মধ্যে বিদ্যমান ঘোটুল পূর্ণবিকশিত যুমঘরের প্রতীক। এদের মধ্যে ঘোটুল সাধারণত নির্মিত হয় গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, কাঠের খুঁটির দ্বারা পরিবেষ্টিত এক প্রাঙ্গণের মধ্যে। ঘোটুলের মধ্যে দাওয়া বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় গৃহ থাকে এবং ইহার সংলগ্ন ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর থাকে। ঘোটুলের ভেতরটায় নানারকম চিত্র অঙ্কিত ও খোদিত থাকে। অনেকস্থলেই এ সকল চিত্র যৌন অর্থব্যঞ্জক। মাঝখানের কাঠের খুঁটিটির গায়ে একটি বৃহদাকার স্ত্রীযোনি খোদিত থাকে। আবার কোন কোন জায়গায় প্রকাণ্ডাকার পুরুষাঙ্গবিশিষ্ট এক তরুণ এক তরুণীকে আলিঙ্গন করে ধরে আছে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত থাকে।

ঘোটুলের ছেলেদের বলা হয় "চেলিক" আর মেয়েদের বলা হয় "মতিয়ারি"। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সমস্ত ছেলেমেয়ে ঘোটুলে এসে সমবেত হয়। ঘোটুলে প্রথম প্রবেশ (বা দীক্ষা) উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠান পালিত হয় না। তবে ঘোটুলের সদস্যভুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক। সকল ছেলেমেয়েকেই ঘোটুলে প্রবেশ করতে হয়। কোন কারণেই কাহাকেও অব্যাহতি দেওয়া হয় না। ঘোটুলের নিয়মানুবর্তিতা হচ্ছে খুব কঠোর। এই কারণে ঘোটুলের নিয়ম-কানুন কেউ অগ্রাহ্য করতে সাহস করে না। ঘোটুলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ একজনকে দলপতি নির্বাচিত করা হয়। তাকে বলা হয় "শিলাদার" বা "চালাও"। সেই ঘোটুলের ছেলেমেয়েদের মাতব্বর হিসাবে কাজ করে। চেলিক ও মতিয়ারিদের সেই পরিচালনা করে।

ঘোটুলের মধ্যে দুরকমের নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায়। প্রথম রকমের নিয়মানুবর্তিতা অনুযায়ী কোন বিশেষ ছেলে কোন বিশেষ মেয়ের সঙ্গে "জুরিদার" সম্পর্ক স্থাপন করে। তারা বিবাহিতের ভণিতা নিয়ে বাস করে, তবে যে কোন সময় তারা এ সম্পর্ক চ্যুত

করতে পারে। তবে যতদিন তারা "বিবাহিত" থাকে ততদিন তাদের পক্ষে ব্যভিচার দণ্ডনীয় হয়। দ্বিতীয় রকমের নিয়মানুবর্তিতা অনুযায়ী যে কোন ছেলে যে কোন মেয়ের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, তবে পরপর তিনদিনের বেশী যদি কেউ কোন মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করে তবে তার জন্য তাকে দণ্ড পেতে হয়। যেখানে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে "জুরিদার" সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেখানে প্রায়ই দেখা যায় যে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থায়ী হয়। তবে প্রকৃত বিবাহের বয়স হলে তাদের নিয়মানুগ বিবাহ করতে হয়।

ঘোটুলের দ্বিতীয় রকমের সম্পর্ককে "মুণ্ডি বদলানা" বলা হয়। এ সম্পর্ক কখনও স্থায়ী হয় না, কেননা কোন ছেলে পরপর তিনদিনের বেশী কোন মেয়েকে নিজের অধিকারে রাখতে পারে না। যদি রাখে তা হলে সেটা ব্যভিচার বলে গণ্য হয়। ভবিষ্যতে অপরের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তুতি হিসাবে স্থায়ী সম্পর্ক ভাল নয় বলে মনে করা হয়। তারা বলে যে "বিবাহের আগে অধিক প্রেম মানে বিবাহের পর স্বল্প প্রেম"। এছাড়া মুরিয়ারা আরও বিশ্বাস করে যে অনবরত জুরিদার পরিবর্তন করলে যৌনসংসর্গে সন্তানবতী হবার সম্ভাবনা কম থাকে। কার্যক্ষেত্রে শিলাদার বা চালাও প্রত্যেক ছেলের জন্য মেয়ে নির্বাচন করে দেয়। ঘোটুলের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, কী সুন্দরী, কী কুৎসিতা সকল মেয়েই সমান অধিকার পায় যৌন চর্চার জন্য। ছেলেদের পক্ষেও ঠিক তাই প্রযোজ্য।

ঘোটুলের মধ্যে কেহ ব্যভিচার করলে তাকে ঘোটুল থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়। ঘোটুল থেকে বহিষ্কৃত ছেলে বা মেয়ের প্রকৃত বিবাহের সময় কোন নাচ-গান করা হয় না। মুরিয়াদের মধ্যে বিবাহে নাচ-গানের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ যে বিবাহের সময় নাচ-গান না হলে সেটা গুরুতর শাস্তি বলে ধরা হয়। এ ছাড়া অন্য রকমের শাস্তিও আছে। যেমন, ব্যভিচারিণী মেয়ের যোনির মধ্যে ছাই ভরে দেওয়া হয়।

ঘোটুলের কোন মেয়ের বিবাহের পর তাকে আর ঘোটুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু বিবাহের আগে যেদিন সে ঘোটুল থেকে শেষবারের মত বিদায় নেয় সেদিন তাকে ঘোটুলের সমস্ত ছেলের চিত্তবিনোদন করতে হয়। ছেলেদের বেলায় কিন্তু নিয়ম স্বতন্ত্র। বিবাহের পর যতদিন না ঘোটুলের সমস্ত সদস্যদের সে ভোজ দেয় ততদিন তাকে ঘোটুলে আসতে দেওয়া হয়। তবে এরূপ ভোজ সাধারণত তিন চার মাসের মধ্যেই দেওয়া হয়। ভোজ দেওয়া হয়ে গেলে তাকে চিরদিনের মত ঘোটুল থেকে বিদায় নিতে হয়।

ঘোটুলের প্রচলন সম্বন্ধে মুরিয়ারা নানা রকম যুক্তি দর্শায়। তার মধ্যে প্রধান যুক্তি হচ্ছে, ছেলে-মেয়েদের সামনে বাপ-মায়ের যৌন ক্রিয়া করা পাপ। সেইহেতু যখনই ছেলেমেয়ে যৌন ক্রিয়ার অর্থ বুঝতে পারে তখনই তাকে ঘোটুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যদি কোন কারণে রাত্রে কোন মেয়ে ঘোটুল থেকে বাড়ীতে ফিরে আসে এবং বাপ-মাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখে তবে তার বাপ-মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করে বলে "তোর কি ঘোটুল নেই, তুই কিজন্য এখানে এসেছিস?"

বাপ-মায়ের যৌনজীবন ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে গোপন রাখা ছাড়া ঘোটুলের অপর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, উত্তরকালে ছেলে-মেয়ের যৌনজীবন যাতে সার্থকতা ও পূর্ণতা লাভ করতে পারে সে সম্বন্ধে ঘোটুল প্রস্তুতি শিক্ষা দেয়।

ঘোটুলের ছেলেমেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে, ঘোটুলের ভেতর কী ঘটেছিল তা ঘোটুলের বাইরে কারুকে বলা। সেজন্য তাদের বিশ্বাস যে তারা ঘোটুলের ভেতর কী করেছে বা না করেছে তা তাদের বাপ-মা কেউ টের পায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাপ-মা সবই জানে। তবে পরস্পরের কাছে প্রকাশ করাটা দূষণীয় বলে মনে করে। এর জন্য ঘোটুলের উপর ছেলেমেয়েদের আস্থা দৃঢ়তর হয়। এই কারণে ঘোটুলের মধ্যে অজাচারের জন্য কোন দণ্ড

দেওয়া হয় না। কিন্তু এরূপ অজাচারের ফলে যদি ঘোটুলের কোন মেয়ে সন্তানবতী হয় তা হলে ঘোটুলের ভেতরে ও বাইরে উভয় স্থানেই তাকে দণ্ড দেওয়া হয়।

ঘোটুলের মধ্যে মেয়ে থাকাকালীনই মুরিয়া পিতামাতা অপরের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধে বাগ্‌দান করে। যেখানে বাগ্‌দত্তা কোন মেয়ে ঘোটুলের মধ্যে সন্তানবতী হয় সেক্ষেত্রে যাকে বাগ্‌দান দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গেই তার বিবাহ দেওয়া হয় এবং তাকেই সন্তানের পিতা বলে গণ্য করা হয়।

এখানে একথা বলা দরকার যে বিবাহের পূর্বে মেয়ের গর্ভবতী হওয়া মুরিয়ারাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে অশোভনীয় নয়। মুরিয়ারা বলে, "হাতী যখন মোটা মোটা চারটে পা থাকা সত্ত্বেও হোঁচট খায় তখন ছোট ছোট মেয়েদের কা কথা।"

অবশ্য ঘোটুলের মধ্যে গর্ভ হওয়া খুব বিরল ঘটনা। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, ঘোটুলের মধ্যে তরুণ-তরুণী ঘনঘন যৌন সঙ্গম করা সত্ত্বেও গর্ভ হয় না কেন? এ সম্পর্কে মুরিয়ারা বলে যে, তাদের দুই দেবতা "লিঙ্গ পেন" ও "ধরিত্রী দেবী" মেয়েদের গর্ভবতী হওয়া থেকে তাদের রক্ষা করে। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঋতুর পর যে সময়টা গর্ভধারণের পক্ষে প্রশস্ত সে সময়টা তারা যৌনসঙ্গমের জন্য পরিহার করে। তাছাড়া ঘনঘন জুরিদার পরিবর্তনও গর্ভধারণের বিরোধী। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেন যে কৈশোরে মেয়েদের বয়ঃসন্ধির পূর্বে এমন একটা সময় আছে, যে সময় তাদের গর্ভধারণ শক্তি থাকে না। বাস্তবক্ষেত্রে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে প্রথম ঋতুসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা গর্ভধারণ করে না। প্রথম ঋতুসঞ্চারের সময় থেকে গর্ভধারণ করবার শক্তি অর্জন করা পর্যন্ত কিছুকালের জন্য একটা সময়ের ব্যবধান থাকে। এই কারণেই ঘোটুলের মেয়েদের মধ্যে খুব কম মেয়ে গর্ভবতী হয়।

॥ সপ্ত ॥

বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সংসর্গ

জগতের অধিকাংশ সমাজেই স্বামী বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলনের একাধিপত্য পায়। কিন্তু এমন অনেক সমাজ আছে যেখানে সামাজিকভাবে এই অধিকার অপরকে সমর্পণ করা হয়। যৌন মিলনের জন্য নিজের স্ত্রীকে অপরের হাতে সমর্পণ করবার পিছনে যে যুক্তি আছে সেটা হচ্ছে এই যে, যেহেতু স্বামীই হচ্ছে স্ত্রীর একমাত্র অধিকারী সেইহেতু তার ক্ষমতা আছে সেই অধিকার সাময়িকভাবে অপরকে সমর্পণ করবার। অনেক সমাজে এই অধিকার বিশেষভাবে সমর্পিত হয় অতিথির কাছে। যৌন মিলনের অধিকার সমর্পণ করে আতিথেয়তা পালন করা প্রাচীনকালে বহু সমাজে প্রচলিত ছিল। বর্তমানকালেও অনেক সমাজে এ রীতি আছে। বিখ্যাত সমাজ-তত্ত্ববিদ্ ওয়েষ্টারমারক্ বলেন যে যৌন আতিথেয়তা সাধারণ আতিথেয়তারই এক সম্প্রসারিত ক্রিয়ামাত্র। আদিমসমাজে অবচেতন মনে অতিথি সম্পর্কে ভয়, সন্ত্রাস, শ্রদ্ধা ইত্যাদি নানারূপ অনুভূতির উপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। মানুষ অপরিচিত আগন্তুককে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই ভয় করে এসেছে। সেজন্য এরূপ আগন্তুককে অতিথিরূপে যখন গ্রহণ করা হয় তখন তার সন্তোষবিধানের জন্য অতিথিসেবক সবসময় প্রস্তুত থাকে সাময়িকভাবে তার কাছে নিজের স্ত্রী বা মেয়েকে পর্যন্ত সমর্পণ করতে।

যৌন আতিথেয়তা প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল। মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে। বিশেষ করে অনুশাসন পর্বে সুদর্শন ও ওঘাবতীর

কাহিনী এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে। সুদর্শন অত্যন্ত ধর্ম-পরায়ণ ছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম পালন করেই মৃত্যুকে জয় করবেন সঙ্কল্প করেছিলেন। স্ত্রী ওঘাবতীকে অতিথি সৎকারের কাজে নিয়োজিত করে তিনি তাকে আদেশ দেন যে, প্রয়োজন হলে ওঘাবতী যেন নির্বিচারে নিজেকেও অতিথির কাছে সমর্পণ করে। কেননা, অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেউ নেই। একদিন তাঁর আদেশের সততা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর অনুপস্থিতকালে যমরাজ স্বয়ং ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে ওঘাবতীর সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। ওঘাবতী প্রথমে কৌশল করে এটা এড়াবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্রাহ্মণবেশী ধর্মকে নাছোড়বান্দা দেখে অগত্যা তার সঙ্গে যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হন। এই সময় সুদর্শন ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে সামনে দেখতে না পেয়ে তাকে বারবার ডাকতে থাকেন। কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। কেননা ওঘাবতী তখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে যৌনমিলনে নিযুক্ত থাকায় নিজেকে অশুচি জ্ঞান করে স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেন না। এমন সময় অতিথি ব্রাহ্মণ ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সুদর্শনকে বলেন যে ওঘাবতী তার কামনা পূর্ণ করেছে। ওঘাবতীর অতিথিপরায়ণতা দেখে সুদর্শন অত্যন্ত প্রীত হন। ধর্ম তখন আত্মপ্রকাশ করে বলেন, "সুদর্শন, তুমি তোমার সততার জন্য এখন থেকে মৃত্যুকে জয় করলে।"

মহাভারতের আদিপর্বে উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুর কাহিনী থেকেও আমরা এর আভাস পাই। একদিন শ্বেতকেতু যখন পিতামাতার কাছে বসেছিলেন সেইসময় এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁর মায়ের সঙ্গে যৌনমিলন কামনা করে তাকে কক্ষান্তরে নিয়ে যায়। শ্বেতকেতু এতে ক্রুদ্ধ হয় কিন্তু পিতা উদ্দালক বলেন, "স্ত্রীলোক গাভীদের মত স্বাধীন। সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তাদের অধর্ম হয় না—ইহাই সনাতন ধর্ম।" মহাভারতে আরও উল্লিখিত আছে যে সনৎসুজাত অর্জুনকে বলেছিলেন যে বন্ধুত্বের ষড়গুণের মধ্যে অন্যতম

হচ্ছে বন্ধুর নিকট নিজ পুত্র ও স্ত্রীকে সমর্পণ করা। কৃষ্ণও বন্ধুর কাছে পুত্র এবং স্ত্রীকে সমর্পণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কর্ণও বলেছিলেন যে যদি কেউ তাঁকে দেখিয়ে দেয় যে অর্জুন কোথায় আছে তাহলে তিনি তাকে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে সমর্পণ করবেন। মহাভারতের পরবর্তীকালে অবশ্য এ প্রথা ভারতে বিলুপ্ত হয়েছিল।

স্ত্রী বা কন্যাকে অপরের হাতে সমর্পণ করা সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশের সাথিয়া উপজাতির মধ্যে এক বিচিত্র প্রথা প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে কোন চুক্তির শর্ত হিসাবে বা ঋণের জামিনস্বরূপ উত্তমর্ণের কাছে নিজের স্ত্রী, কন্যা বা অপর কোন আত্মীয়াকে বন্ধক রাখা হয়। ঋণ পরিশোধ বা চুক্তির শর্ত প্রতিপালন না হওয়া পর্যন্ত ওই স্ত্রী বা কন্যা পাওনাদারের গৃহেই থাকে।

বন্ধকী অস্থাবর সম্পত্তি ভোগদখল করবার যেমন উত্তমর্ণের অধিকার থাকে এক্ষেত্রে ওই স্ত্রী বা কন্যাকে ভোগ করবার সম্পূর্ণ অধিকারও পাওনাদারের থাকে। এই অবস্থায় পাওনাদারের গৃহে যদি ওই স্ত্রী বা কন্যা সন্তানবতী হয় তাহলে সে নিজ গৃহে পুনরায় ফিরে আসবার সময় ওই সন্তানকে পাওনাদারের গৃহে রেখে আসে। সাথিয়ারা এরূপভাবে স্ত্রী বা কন্যাকে বন্ধক রাখা মোটেই লজ্জাজনক বা নীতিবিগর্হিত ব্যাপার বলে মনে করে না।

ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ পরস্ত্রীর সহিত যৌনমিলন তন্ত্রশাস্ত্রে অনুমোদিত আছে। তান্ত্রিকসাধনার মূল কথা হচ্ছে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন। এই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনকে তন্ত্রশাস্ত্রে গূহ্য রূপ দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ "ম"-কার সহকারে চক্র-পূজার ব্যবস্থা আছে। পঞ্চ "ম"-কার হচ্ছে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। তন্ত্রপূজার এগুলি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। তন্ত্রে শক্তিসাধনা বা কুলপূজার উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। কোন স্ত্রীলোককে শক্তির প্রতীক ধরে নিয়ে তার সঙ্গে যৌনমিলনে রত থাকাই শক্তিসাধনার মূলতত্ত্ব। গুপ্তসংহিতায় বলা হয়েছে, সে ব্যক্তি পামর,

যে ব্যক্তি শক্তিসাধনার সময় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন-ক্রিয়ায় নিজেকে না নিযুক্ত রাখে; নিরুক্ততন্ত্র এবং অন্যান্য অনেক তন্ত্রে বলা হয়েছে যে শক্তিসাধক কুলপূজা হতে কোনরূপ পুণ্যফল পায় না, যদি না সে কোন বিবাহিতা নারীর সহিত যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হয়। এ কথাও বলা হয়েছে যে কুলপূজার জন্য কোন নারী যদি সাময়িক ভাবে স্বামীকে পরিহার করে তবে তার কোন পাপ হয় না। আরও বলা হয়েছে যে কুলপূজার জন্য প্রশস্তা নারী হচ্ছে ষোড়শী, সুদর্শনা এবং বিপরীত-রমণে সিদ্ধা। তবে অনূঢ়া কিংবা গণিকাকেও কুল-পূজার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনেক সময় ধর্মের রূপ দিয়ে কামাচারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বিবাহিতা নারীকে প্রলুব্ধ করতো তার সতীত্ব বিসর্জন দিতে। এরূপ ভাবে প্রলুব্ধ হয়ে সতীত্ব বিসর্জন দেবার এক কাহিনী অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্যটক আবে দুবোয়া তার গ্রন্থে বিরত করে গেছেন। তিনি বলেছেন যে দক্ষিণ ভারতে এমন কতকগুলি মন্দির আছে যেখানকার পুরোহিতরা প্রচার করে যে আরাধ্য দেবতার অত্যাশ্চর্য শক্তি আছে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাতা দূর করবার। এরূপ মন্দিরের মধ্যে কর্ণাটদেশের তিরুপতির মন্দির বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এখানকার দেবতা ভেন-কাটেশ্বরের কাছে অসংখ্য স্ত্রীলোক আসে সন্তান কামনায়। পুরোহিতগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তারা মন্দিরে রাত্রিযাপন করে। পুরোহিতরা তাদের বলে যে তাদের ভক্তি দ্বারা প্রীত হয়ে ভেনকাটেশ্বর রাত্রিকালে তাদের কাছে আসবে এবং তাদের গর্ভবতী করে দিয়ে যাবে। তারপর যা ঘটতো তা না বলাই ভাল। পাঠক তা সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন। পরদিন প্রভাতে এই সকল জঘন্য চরিত্রের ভণ্ড তপস্বীরা কিছুই জানে না এরূপ ভান করে ওই সকল স্ত্রীলোকদের কাছে এসে দেবতার করুণা লাভ সম্বন্ধে বিশদভাবে অনুসন্ধান করত এবং তারা দেবতার অনুগ্রহ লাভ করেছে বলে তাদের পুণ্যবতী আখ্যা দিয়ে তাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করত। দেবতার

সঙ্গে তাদের যৌনমিলন ঘটেছে এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এই সকল হতভাগিনী নারীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেত।

দক্ষিণ ভারতের অপর একস্থানেও আবে দুবোয়া যে প্রথা দেখেছিলেন তার বিবরণও তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, কোন কোন জনবিরল অঞ্চলে এমন অনেক মন্দির আছে যেখানে দেবতাদের প্রীতির জন্য অতি জঘন্য ধরণের লাম্পট্যের লীলা চলে। এসকল স্থানে বন্ধ্যা নারীরা সবরকম লজ্জাসরম বিসর্জন দিয়ে নির্বিচারে ও নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হয়। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে এই সকল স্থানে উচ্ছৃঙ্খলতার এক উৎসব হয় এবং ওই উৎসবের সময় সকল শ্রেণীর নরনারী (বিশেষ করে গ্রামের জঘন্য চরিত্র লোকেরা) ওই সব স্থানে সম্মিলিত হয়। বন্ধ্যা নারীরা এখানে দেবতার কাছে এসে মানত করে যে তারা যদি সন্তানবতী হতে পারে তাহলে দেবতার প্রীতির জন্য কোন বিশেষ সংখ্যক পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে তবে বাড়ী ফিরে যাবে। এমন কি যেসব নারী বন্ধ্যা নয় তারাও দেবতার প্রতি তাদের ভক্তি প্রদর্শনের জন্য অতি নির্লজ্জভাবে অপরের সহিত যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হতো।

ধর্মের নামে আর এক রকমের গণিকাবৃত্তিও মন্দির সমূহে প্রচলিত ছিল। এ হচ্ছে দেবদাসী প্রথা। সেকালে দেবতার প্রীতির জন্য অনেকে নিজের মেয়েদের উৎসর্গ করতো দেবতার কাছে। এরা মন্দিরে থাকতো এবং এদের দেবদাসী বলা হতো। এদের উত্তমরূপে নাচ-গান শেখান হতো এবং তারা দেবতার সামনে নৃত্যগীত করতো। দেবদাসী যে হিন্দু-মন্দিরেই থাকতো তা নয়, বৌদ্ধমন্দিরেও থাকতো। কালক্রমে দেবদাসী প্রথা কদর্য গণিকাবৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল। এখনও অনেক মন্দিরে দেবদাসী প্রথা জীবিত আছে।

দেবদাসী প্রথা কত প্রাচীন তা জানা নেই। তবে মধ্যযুগের বাংলাদেশের বড় বড় মন্দিরে যে অনেক দেবদাসী থাকতো তার

প্রমাণ আমরা ভবদেব ভট্টের "ভুবনেশ্বরী প্রশস্তি" এবং বিজয় সেনের "দেওপাড়া প্রশস্তি"তে পাই। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" ও ধোয়ীর "পবনদূত" কাব্যদ্বয়েও দেবদাসীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। অনেক সময় দেবদাসীরা রাজানুগ্রহ লাভ করে রাজার গৃহিণীও হতেন। "রাজতরঙ্গিনী" থেকে জানা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর বাংলার পুণ্ড্রবর্ধন নগরে অবস্থিত কার্তিকেয়ের মন্দিরে কমলা নাম্নী এক অলৌকিক রূপগুণসম্পন্না দেবদাসী ছিল। কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বিনয়াদিত্য তার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করেছিলেন। ওড়িষ্যার সোমবংশীয় নরপতি কর্ণরাজের রত্নগিরি তাম্রশাসন থেকেও আমরা জানতে পারি যে তার মহিষী কর্পূরশ্রী বিবাহের পূর্বে সলোনপুরের বিহারস্থিত বৌদ্ধমন্দিরে দেবদাসী ছিলেন। আরও জানা যায় যে কর্পূরশ্রীর মা-ও দেবদাসী ছিলেন।

বিবাহ-বহির্ভূত যৌন-মিলনের যে সকল দৃষ্টান্ত উপরে উল্লিখিত হলো সেগুলোর পিছনে সামাজিক বা ধর্মীয় অনুমোদন ছিল। এরূপ অনুমোদনের যেখানে অভাব ঘটতো সেখানে অবৈধ যৌনসংসর্গকে ব্যভিচার বলা হতো। হিন্দু ও আদিবাসী এই উভয় সমাজেই ব্যভিচার বরদাস্ত করে না। হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যভিচারের তারতম্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সকল রকম ব্যভিচারের মধ্যে গুরুতল্পই (গুরু-স্ত্রীর সহিত যৌনসংসর্গ) হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জঘন্য। এরজন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মনু বলেছেন, গুরুতল্প অপরাধের শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর চক্ষু উৎপাটন ও যৌনাঙ্গকর্তন করা হবে ও তাকে জলন্ত লৌহপট্টের উপর উপবেশন করানো হবে।

অন্যান্য রকম ব্যভিচার সম্পর্কে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, প্রায়শ্চিত্ত করে ও অর্থদণ্ড দিয়ে তার স্খলন করা যায়। তবে কেহ যদি অবাঞ্ছিত নারীর সঙ্গে ব্যভিচার অপরাধে লিপ্ত হয় তা হলে তাকে কঠোর শাস্তিভোগ করতে হবে। এই সকল বিশেষ শ্রেণীর নারীর অন্যতমা ছিল প্রতিপালিতা, বন্ধুপত্নী, সগোত্রা, পরিব্রাজিকা

ও কুমারী। নারদের মতে তপস্যারতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার অজাচারের সামিল। সকলক্ষেত্রে গুরুতল্পের মত কঠোর দণ্ড দেওয়া হতো। কিন্তু উত্তরকালে দণ্ডের অনেক লঘুকরণ করা হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই সকল অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কৌটিল্য মাত্র ২৪ পণ অর্থদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।

আর একরকম ব্যভিচারের জন্যও স্মৃতিশাস্ত্রে কঠোর শাস্তির নির্দেশ আছে। সেটা হচ্ছে উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে হীনবর্ণের পুরুষের ব্যভিচার। এক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই প্রকাশ্যস্থানে কুকুরদ্বারা খণ্ড-বিখণ্ডিত করাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে উচ্চবর্ণের পুরুষেরও শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তার জন্য অনেক ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ডেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণত তাকে রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হতো। অন্ত্যজ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচারের জন্য শূলে চাপিয়ে বধ করাই সাধারণ দণ্ড ছিল। ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য ও শূদ্র নারী যদি ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্যভিচার করতো তা হলে তাকে দগ্ধ করে মারা হতো। ওই একই শাস্তি দেওয়া হতো পুরুষকে, যদি সে ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করতো বা বৈশ্য পুরুষ যদি ক্ষত্রিয়া নারীর সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করতো।

তবে স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিনাদণ্ডে কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করা যেতো। এদের মধ্যে ছিল গণিকা ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের স্বৈরিণী। এ সব ক্ষেত্রে একে ব্যভিচার বলা হতো না। তবে পরগ্রহ বা অপরের রক্ষিতা নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম ব্যভিচার বলেই গণ্য হতো। আবার অপর পক্ষে নারদ বলেছেন যে স্বামী পরিত্যক্তা নিষ্কলঙ্কা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌনমিলন ব্যভিচার বলে গণ্য হবে না। স্বামী যদি নপুংসক হন, কী ক্ষয়রোগাক্রান্ত হন, সেক্ষেত্রেও অপর পুরুষের সহিত যৌনসঙ্গম ব্যভিচার বলে গণ্য হবে না।

উত্তরকালে হিন্দুসমাজে নারীর সতীত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব

দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে ভারতে দাম্পত্য সম্পর্ক যে কত পূত হয়েছিল, তা পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের কল্পনার বাইরে।

ভারতের আদিবাসীসমাজেও ব্যভিচার খুব গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ। একই টটেম বা গোষ্ঠীভুক্ত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার অজাচার বলে গণ্য হয় এবং তার জন্য খুব কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়। যেমন ভানটু উপজাতির মধ্যে এরূপ অপরাধের জন্য মাথার চুল ও গোঁফ কামিয়ে সেই চুল গ্রামের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এর উদ্দেশ্য অপরকে সতর্ক করে দেওয়া। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে আদিবাসীসমাজে ব্যভিচার খুবই বিরল। কিন্তু ব্যভিচার যখন ঘটে তখন তার জন্য কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়।

বর্তমানে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুযায়ী ব্যভিচার সকল শ্রেণীর নর-নারীর পক্ষেই দণ্ডনীয় অপরাধ।

। দশ ।

হিন্দুসমাজে গণিকার স্থান

বিবাহ বহির্ভূত যৌন সংসর্গের মধ্যে গণিকাবৃত্তি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। গণিকা বলতে আমরা সেই স্ত্রীলোককে বুঝি যে স্ত্রীলোক অর্থের বিনিময়ে পুরুষনির্বিশেষে যৌনমিলনে রত হয় বা নিজের দেহ সমর্পণ করে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে গণিকাবৃত্তি প্রচলিত হয়ে এসেছে। রামায়ণ ও মহাভারত—এই উভয় মহাকাব্যেই গণিকার উল্লেখ আছে। বস্তুত প্রাচীন ভারতের নাগরিক জীবনে গণিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকাব করতো। নাচ-গান করবার জন্য উৎসবের সময় প্রায়ই তাদের ডাকা হতো। পুরাণে উক্ত হয়েছে যে, গণিকা দর্শনে দিন ভাল যায়। বিষ্ণুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে যদি কেহ যাত্রায় শুভ চায় তা হলে সে যেন নিশ্চয় গণিকার মুখ দেখে বের হয়। এ ছাড়াও গণিকারা প্রাচীন ভারতে মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকাব করতো ও উৎসব উপলক্ষে তাদের বসবার জন্য বিশিষ্ট আসন দেওয়া হতো। মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে উৎসবের সময় তারা রক্তবর্ণ বস্ত্র, মালা ও স্বর্ণালঙ্কার পরতো। উৎসবে যোগদান ছাড়া যুদ্ধের সময়ও তারা সৈন্যবাহিনীর অনুচারিণী হতো। রাজা-রাজড়ারাও অনেক সময় তাদের প্রাসাদ অভ্যন্তরে রাখতেন। এ ছাড়া ভিন্ন দেশীয় কোন নৃপতি এলে বারাঙ্গনারা নগরের বাইরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনতো। তাছাড়া আগন্তুক অতিথি রাজার অধিকার থাকতো সম্পূর্ণ মুক্তভাবে গণিকাদের গৃহে গমন বা প্রবেশ করবার। এক কথায় প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবনে গণিকার বিশেষ গৌরবময় ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিল।

একদিকে যেমন মহাকাব্যসমূহে বারাঙ্গনাদের গৌরবময় চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে অপরদিকে আবার স্মৃতিকাররা তাদের নিন্দা করে গেছেন। বৃহস্পতি (২২।৯) তাদের প্রবঞ্চক ও জুয়ারীদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন। অন্য স্মৃতিকাররাও তাদের প্রবঞ্চক ও তস্কর বলে অভিহিত করেছেন। মনু বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ কিংবা গৃহস্থব্যক্তির পক্ষে তাদের কাছ থেকে দান কিংবা ভক্ষদ্রব্য গ্রহণ করা দূষণীয়। একথাও বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ কখনও গণিকাগৃহে গমন করবে না এবং যদি যায় তাহলে তাকে কৃচ্ছ্র সাধন করে পূত হতে হবে। পরাশর (৯।১০।১২) ও মহানির্বাণ তন্ত্রে (৪০।৪৩) বলা হয়েছে যে গণিকার সঙ্গে যৌনমিলন ও পুংমৈথুন একই শ্রেণীভুক্ত। গৌতম (২২।২৩) বলেছেন যে, যদি কেহ কোন বারাঙ্গনাকে হত্যা করে তবে তার জন্য তাকে কোন শাস্তি পেতে হবে না।

স্মৃতিকাররা নির্দেশ দিয়েছেন গণিকারা যেন তাদের বৃত্তি সম্মানের সঙ্গে অনুসরণ করে। যাজ্ঞবল্ক (২।২৯২) বলেছেন যদি কোন বারাঙ্গনা কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে এবং পরে তার সঙ্গে যৌন মিলনে অনিচ্ছুক হয় তা হলে তাকে গৃহীত অর্থের দ্বিগুণ প্রত্যর্পণ করতে হবে। অগ্নিপুরাণও তার প্রতিধ্বনি করে অনুরূপ বিধান দিয়ে বলেছে যে, দ্বিগুণ অর্থ প্রত্যর্পণ করা ছাড়া তাকে রাজকোষেও কিছু অর্থ দণ্ড দিতে হবে। কৌটিল্যও কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ প্রত্যর্পণ করবার কথা বলেছেন। কৌটিল্য আরও বলেছেন যে যদি কোন গৃহীত ব্যক্তির সহিত কোন গণিকার বিবাদ হয় তা হলে প্রধান গণিকা ওই বিবাদের মীমাংসা করে দেবে।

তন্ত্রে গণিকাদের এক প্রশস্ত স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, চক্রপূজায় পাঁচ শ্রেণীর গণিকা শক্তি বা দেবীর স্থান অধিকার করতে পারে। এই পাঁচ শ্রেণীর গণিকার নাম দেওয়া হয়েছে রাজবেশ্যা, নাগরী, গুপ্তবেশ্যা, দেববেশ্যা ও ব্রহ্মবেশ্যা বা তীর্থগ।

এ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে প্রাচীনকালে গণিকাদের মধ্যে

শ্রেণীবিভাগ ছিল। রাজবেশ্যা বলতে বুঝাতো রাজার দ্বারা অনুগৃহীত গণিকা, নাগরী বলতে বুঝাতো নগরবাসিনী গণিকা, গুপ্তবেশ্যা বলতে বুঝাতো সদ্বংশীয়া নারী, যে গোপনে অভিসার করে, দেববেশ্যা বলতে মন্দিরের দেবদাসীদের বুঝাতো এবং ব্রহ্মবেশ্যা বা তীর্থগ বলতে বুঝাতো তীর্থস্থানে যারা গণিকাবৃত্তি করতো।

উপরের এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, জগতের অন্যান্য জাতির তুলনায় একমাত্র হিন্দুদেরই গণিকার প্রতি একটা অনুকূল মনোভাব ছিল, যদি গণিকারা সম্মান ও শ্লীলতার সঙ্গে তাদের বৃত্তির অনুশীলন করতো। এই কারণে প্রাচীন ভারতে গণিকাদের বিষয় নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এরূপ রচয়িতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন দত্তক। দত্তক পাটলিপুত্র নগরেব বারাঙ্গনাদের সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দত্তকের ওই রচিত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের সারাংশ বাৎসায়ণ তাঁর কামসূত্র গ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ করেছিলেন। যদিও এই বিববণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারের তথাপি গণিকাদের সম্পর্কে এরূপ বিশদ বিবরণ প্রাচীন সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। কামসূত্রের এই বিবরণের কিছু কিছু অংশ নীচে দেওয়া গেল।

গণিকা তার বৃত্তির অনুশীলন করে কেবল যে যৌনসুখ লাভ করে তা নয়, সে এর দ্বারা নিজের জীবিকাও অর্জন করে। গণিকা সুসজ্জিতা ও সালঙ্কৃতা হয়ে উপবিষ্টা থাকবে তার গৃহদ্বারে এবং নিজেকে অধিকমাত্রায় প্রকট বা প্রদর্শন না করে পথের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকবে যে তার উপর পথচারীদের দৃষ্টি পড়বে। বারাঙ্গনাদের কী কী লক্ষণ থাকা দরকার সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাকে সুন্দরী, মিষ্টভাষিনী ও সুলক্ষণা হতে হবে। অপরের অর্থের প্রতি যে তার লোভ থাকবে তা নয়, অপরের গুণের প্রতিও তার অনুরাগ থাকা চাই ও অপরের সঙ্গে প্রেম ও সঙ্গম করে তার আনন্দ পাওয়া চাই। যেসব ব্যক্তিকে সে মনোরঞ্জনের জন্য গ্রহণ

করবে না সে সম্বন্ধেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, অসুস্থ ব্যক্তি, যে ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও মুখ থেকে পুরীষের মত দুর্গন্ধ নির্গত হয়, লোভী ব্যক্তি, নিষ্ঠুর ব্যক্তি, তস্কর, অধিকমাত্রায় আত্মগর্বী ব্যক্তি, তুকতাকে পারদর্শী ব্যক্তি, যে ব্যক্তি অপরকে সম্মান প্রদর্শন করতে জানে না, যে ব্যক্তি নিজ শত্রু দ্বারা ও অর্থের দ্বারা বশীভূত হয় এবং যে ব্যক্তি অত্যন্ত লজ্জাশীল। আগত ব্যক্তিকে কিভাবে আপ্যায়ন করবে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে, প্রমোদকারী যখন তার গৃহে আসবে সে তখন তাকে তাম্বুল, মাল্য ও সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা সংবর্দ্ধনা করবে, তাকে শিল্প-কলায় নিজের পারদর্শিতা দেখাবে, তার সঙ্গে আলাপনে নিযুক্ত থাকবে, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে উপহার বিনিময় করবে এবং যৌন-কর্মে নৈপুণ্য দেখাবে। আচার্যগণ বলেন, পরিচিত প্রমোদকারীর পরিবর্তে সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রমোদকারীকেই সে সব সময় নির্বাচন করবে। আচার্যগণের এই উক্তি উদ্ধৃত করে বাৎসায়ণ বলেছেন যে, যেহেতু পরিচিত প্রমোদকারী অপেক্ষা অপরিচিত প্রমোদকারীর কাছ থেকে অধিক পরিমাণ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে সেই হেতু অপরিচিত প্রমোদকারীকেই তার পছন্দ করা উচিত।

গণিকাবৃত্তি হিন্দুযুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। যদিও ইংরাজরা গণিকাবৃত্তিকে খুব আনুকুল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন না তথাপি তাঁরা এর বিলোপের কোন চেষ্টা করেন নি। তবে গণিকাবৃত্তির জন্য বিদেশী মেয়ে যাতে এদেশে না আসে তার প্রতি তাঁরা সযত্ন ছিলেন।

বর্তমানে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুযায়ী ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক মেয়েদের দ্বারা গণিকাবৃত্তি করানো অপরাধ। এ ছাড়া অনেক জায়গায় বেশ্যালয় সংরক্ষণও অপরাধ বলে গণ্য হয়। আরও অনেক বিষয় দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার জন্য আইন রচিত হয়েছে। এ সকল অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—রাস্তায় বা প্রকাশ্যস্থানে দাঁড়িয়ে

খরিদ্দার আহ্বান করা, গণিকার আয়ের উপর জীবিকা নির্বাহ করা, গণিকাবৃত্তির জন্য স্ত্রীলোক সংগ্রহ করা, অসৎ উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোককে আটক রাখা, প্রকাশ্যস্থানে গণিকাবৃত্তির অনুশীলন করা, বেশ্যালয় রক্ষণ বা পরিচালনা করা, বেশ্যালয় হিসাবে ব্যবহারের জন্য বাড়ী ভাড়া দেওয়া এবং নিষিদ্ধ অঞ্চলে গণিকাবৃত্তির অনুশীলন করা।

॥ এগার ॥

মুসলিমসমাজে বিবাহ

মুসলিমসমাজে বিবাহ সম্পর্কে বাধানিষেধ হিন্দুসমাজের তুলনায় অনেক কম। তবে প্রথম বিবাহ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনূঢ়া মেয়ের সঙ্গে হওয়া চাই। পরবর্তী বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধানিষেধ নেই। হিন্দুদের মত মুসলমানসমাজে কোন গোত্রবিভাগ নেই। সেই কারণে বহির্বিবাহের কোন নিয়ম-কানুনও নেই। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে পারে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হয় না তবে বাঞ্ছনীয় বিবাহ হিসাবে খুড়তুতো, জাঠতুতো, মাসতুতো, মামাতো, পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। এরূপ ভাই বোন থাকলে তাদের মধ্যে বিবাহই অগ্রাধিকার পায়। তা না হলে অন্য পরিবারে বিবাহ হয়। এরূপ বিবাহের সমর্থনে বলা হয় যে, এতে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় ও সম্পত্তি অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। তবে কোন কোন জায়গায় ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহের বিরোধিতাও লক্ষিত হয়।

হিন্দুসমাজের মত মুসলিমসমাজেও বিবাহ সর্বজনীন ব্যাপার। সকলকেই বিবাহ করতে হয় এবং চিরকৌমার্য কখনও উৎসাহিত করা হয় না। মুসলিমসমাজে ১৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যে কোন পুরুষ বিবাহ করতে পারে। অভিভাবকদের সম্মতি নিয়ে ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বিবাহ চলে। মুসলিমসমাজে বিবাহে বর ও কনে উভয়েরই সম্মতির প্রয়োজন হয় এবং তা বিশেষভাবে স্পষ্টতার সঙ্গে প্রকাশ করতে হয়। দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের সামনে বিবাহের প্রস্তাব ও স্বীকৃতি একই সময়

করতে হয়। প্রতারণা বা বলপ্রয়োগ দ্বারা বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হয়। মুসলিমসমাজে কোন স্ত্রীলোক মুসলমান ব্যতীত অপর কাহাকেও বিবাহ করতে পারে না। তবে পুরুষরা মুসলমান ব্যতীত "কিতাবিয়া" (ক্রীশ্চান বা ইহুদী) নারীকেও বিবাহ করতে পারে। মুসলিমসমাজে বহুপত্নী গ্রহণের কোন বাধা নেই। তবে চারটির বেশী পত্নী গ্রহণ নিয়মবিরুদ্ধ বলে ধরা হয়।

যদি বিদ্যমান সম্পর্ক অবৈধ বলে গণ্য না হয় তা হলে মুসলিম-সমাজে স্ত্রী-পুরুষ যেখানে স্থায়ীভাবে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করে আসছে কিংবা পুরুষ যদি স্বীকার করে যে সে নারী তার স্ত্রী তাহলে সে সম্পর্ককে বিবাহের পর্যায়ে ফেলা হয়। ইসলামধর্মাবলম্বী কোন-কোন শাখার মধ্যে "মোতা" নামে একরকম বিবাহ প্রচলিত আছে। "মোতা" বিবাহ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িক বিবাহ। অনেক সময় এরূপ বিবাহ মাত্র একদিনের জন্যও স্থায়ী হয়। এরূপ বিবাহে স্ত্রীধনও দেওয়া হয়। কিন্তু এরূপ বিবাহের ফলে উৎপন্ন সন্তানের কোন উত্তরাধিকার থাকে না। তবে পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে এরূপ সন্তানের উত্তরাধিকার দেওয়া চলে। অবশ্য উত্তরাধিকার না থাকলেও সন্তানের বৈধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা বিবাদ ওঠে না। বিচ্ছেদের পর এরূপ বিবাহে স্ত্রী কোনরূপ ভরণপোষণ পায় না। সাধারণত নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে বা তার পূর্বে উভয়ের মধ্যে কেউ মারা গেলে বা স্বামী যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই সময়ের মকুফ করে তা হলে এরূপ বিবাহের ছেদ ঘটে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্ত্রীকে "ইদ্দত" উদযাপন করতে হয়। মুসলিমসমাজে "ইদ্দত" বলতে বোঝায় এক বিবাহ বিচ্ছেদের সময় থেকে নূতন অপর বিবাহের মধ্যবর্তী-কালীন অপেক্ষা করবার সময়।

আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকে মুসলিমসমাজে সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায়। এ সম্পর্কে প্রথাগত রীতি অনুযায়ী ছ'রকম পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে "তালাক" উচ্চারণ করে দাম্পত্য

সম্পর্কের ছেদ ঘটানো। যদি "তালাক" একবার উচ্চারণ করা হয় তাহলে তালাকের পর "ইদ্দত" পালন করতে হয়। আর এক রকমের "তালাক" হচ্ছে স্ত্রীলোকের ক্রমান্বয় তিনটি "তুড়"-এর (মাসিক ঋতু) সময় তিনবার "তালাক" উচ্চারণ করা। তবে প্রত্যাহার না করবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে একই সঙ্গে তিনবার "তালাক" উচ্চারণ করা যেতে পারে। "তালাক" উচ্চারণের সময় কোন সাক্ষী বা স্ত্রীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না স্ত্রী নেপথ্যে থাকলেও "তালাক" দেওয়া যেতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে "ইলা"। "ইলা" হচ্ছে ব্রত গ্রহণ করে চারমাস স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম না করা। তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে "জিহার"। "জিহার" হচ্ছে স্বামী যদি বিবাহের জন্য সম্পর্কিত কোন আত্মীয়ার নাম উচ্চারণ করে তাহলে স্ত্রী তাকে "তালাক" উচ্চারণ করতে বাধ্য করাতে পারে। স্বামী যদি অস্বীকৃত হয় তাহলে স্ত্রী আদালতে গিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করতে পারে। চতুর্থ পদ্ধতি হচ্ছে "খোলা"। যেখানে স্ত্রী স্বামীকে রাজী করিয়ে এবং তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদকে "খোলা" বলা হয়। পঞ্চম পদ্ধতিকে "মুবারত" বলা হয়। "মুবারত" হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ-বিচ্ছেদ। "মুবারতে"র সঙ্গে "খোলা"-র প্রভেদ হচ্ছে এই যে, "খোলা" পদ্ধতিতে স্ত্রী-ই বিবাহ-বিচ্ছেদ চায় আর "মুবারত" পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিবাহ-বিচ্ছেদ চায়। বিবাহ-বিচ্ছেদের ষষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে "তালাক-ই তাফ্‌য়ুজ"। এ ক্ষেত্রে স্বামী দ্বারা আদিষ্ট হয়ে স্ত্রী-ই "তালাক" উচ্চারণ করে।

আদালতের আশ্রয় নিয়েও মুসলিমসমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা যায়। এ সম্বন্ধে ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইনের ২নং ধারায় যে সকল কারণে আদালতকে বিবাহ-বিচ্ছেদ গ্রাহ্য করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ

(১) চার বৎসর যদি স্বামীর কোন খোঁজ-খবর না পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আদালতের রায় ছ'মাসের জন্য মুলতুবী রাখা হয় এবং ওই সময়ের মধ্যে স্বামী যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ওই রায় বাতিল হয়ে যায়।

(২) ছু বৎসর যদি স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণে অমনযোগী হয়।

(৩) সাত বা ততোধিক বৎসরের জন্য যদি স্বামীর কারাদণ্ড হয়।

(৪) তিন বৎসর যদি স্বামী তার দাম্পত্যধর্ম না পালন করে।

(৫) স্বামী যদি নপুংসক হয়। এক্ষেত্রে তার প্রজননশক্তি প্রমাণ করবার জন্য স্বামীকে এক বৎসরের জন্য সময় দেওয়া হয়।

(৬) ছু বৎসর ব্যাপী স্বামী যদি উন্মাদ রোগাক্রান্ত হয়।

(৭) স্বামী যদি কুষ্ঠ বা কোন কুৎসিত যৌনব্যাধিগ্রস্ত হয়।

(৮) ১৫ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হবার আগেই যদি পিতামাতা বা অভিভাবকের সম্মতি অনুসারে তার বিবাহ হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী ১৮ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হবার পর স্বামীকে পরিহার করতে পারে।

(৯) স্বামী যদি স্ত্রীকে দৈহিক বা মানসিক কোনরূপ পীড়া দেয়।

॥ বারো ॥

বিবাহের উপর গণতান্ত্রিক প্রভাব

সাম্প্রতিককালে হিন্দুর যৌনজীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। বলাবাহুল্য পাশ্চাত্য দেশের চিন্তাধারার প্রভাবেই এটা ঘটেছে। পরিবর্তনের সূচনা হয় রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে। স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন্ত স্ত্রীকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলপূর্বক) আহুতি দেওয়া হতো স্বামীর জ্বলন্ত চিতায়। এদেশে কত অভাগিনী নারী যে এভাবে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই নিষ্ঠুর বর্বর প্রথার উচ্ছেদের জন্য রাজা রামমোহন রায় খড়গহস্ত হন। সনাতনীসমাজের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। তিনি লর্ড ডালহাউসীকে সম্মত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ১৮২৯ সালের ২৭নং আইন বিধিবদ্ধ করাতে। এই আইনের ফলে সতীদাহ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। সহমরণের হাত থেকে হিন্দু বিধবা রক্ষা পেলো বটে কিন্তু তার সামনে যে পথ উন্মুক্ত রইল সেটা হচ্ছে সারা জীবন ব্রহ্মচর্যপালন করা। খুব অল্প বয়সে যেসব মেয়ে বিধবা হতো তাদেরও বাধ্য করা হতো এই কঠোর সংযমের বশীভূত হতে। এর ফলে সমাজে নানারূপ দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। বাল-বিধবার এই কঠোর জীবনের প্রতি সৌহার্দ্য হয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বদ্ধপরিকর হন, এই সকল অক্ষতযোনী বাল-বিধবার পুনরায় বিবাহ দেবার জন্য। সনাতনীসমাজ তাঁকেও রেহাই দিল না। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজকে কশাঘাত করবার শক্তির অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। একাই তিনি রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে

দাঁড়ালেন। তিনি প্রবুদ্ধ করলেন তৎকালীন সরকারকে ১৮৫৬ সালের ১৫নং আইন বিধিবদ্ধ করাতে। এই আইন দ্বারা বিধবার বিবাহ বৈধ করা হলো।

তারপর ১৮৭২ সালের ৩নং আইন দ্বারা সবর্ণ বিবাহের বাধাও দূর করা হলো। তবে এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করতে হলে বিবাহ-ইচ্ছুক উভয় পক্ষকেই শপথ করতে হতো যে, তারা হিন্দু নন। কিন্তু ১৯২৩ সালের ৩০নং আইন দ্বারা বিধান দেওয়া হলো যে, অহিন্দু বলে ঘোষণা না করেও অসবর্ণ বিবাহ করতে পারা যাবে। এরপর রায়বাহাদুর হরবিলাস সরদা বদ্ধপরিকর হলেন হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ রোধ করবার জন্য। ১৯২৯ সালের ১৯নং আইনে নির্দেশ দেওয়া হলো যে হিন্দু-বিবাহে ছেলের উপযুক্ত বয়স ন্যূনপক্ষে ১৮ ও মেয়ের বয়স ১৫ হওয়া চাই। ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে চালু হয়ে এই আইন এখনও বলবৎ আছে। হিন্দু বিবাহ সংস্কারের জন্য দুটো বড় রকমের আইন বিধিবদ্ধ করা হয় ১৯৪৬ সালে। ওই বৎসর ১৯নং আইন দ্বারা স্ত্রীকে অধিকার দেওয়া হলো অবস্থা-বিশেষে স্বামী ত্যাগের জন্য। স্বামী যদি কুৎসিত ব্যাধিতে ভোগেন, কী স্ত্রীর প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন যাতে স্ত্রীর নিরাপত্তার অভাব ঘটে, কী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন, কী আবার স্ত্রীগ্রহণ করেন, কী নিজ বাসগৃহে রক্ষিতা এনে রাখেন, কী ব্যভিচারে লিপ্ত হন, কী ধর্মান্তর গ্রহণ করেন, তাহলে ওই আইনের বলে স্ত্রী স্বচ্ছন্দে স্বামী ত্যাগ করে স্বতন্ত্র বসবাস করতে পারবেন। আর ২৮নং আইনে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, সগোত্রে ও সমপ্রবরে বিবাহও বৈধ। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৯ সালের ২১নং আইন দ্বারা বিবাহক্ষেত্রে জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত যত রকম বাধা-বৈষম্য ছিল তা দূরীভূত করা হলো। বিবাহ সম্পর্কে শেষ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে ১৯৫৫ সালে। এটাই হচ্ছে বিবাহ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনটিকে হিন্দুবিবাহ বিধি বা ১৯৫৫

সালের ২৫নং আইন বলা হয়। বৈধ বিবাহের যে সকল শর্ত এতে নির্দিষ্ট হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) বিবাহকালে স্বামীর অন্য স্ত্রী বা স্ত্রীর অন্য স্বামী জীবিত থাকবে না।

(২) উভয়পক্ষের কেহই পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হবে না।

(৩) ন্যূনপক্ষে বরের ১৮ এবং কনের ১৫ বৎসর বয়স হওয়া চাই।

(৪) উভয়পক্ষের কেহই নিষিদ্ধ নিকট আত্মীয়ের মধ্যে হবে না।

(৫) উভয়ের কেহই সপিণ্ড হবে না।

(৬) যেস্থলে কনের বয়স ১৫ বছরের কম সেস্থলেও অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন হবে।

এই আইনে আরও বলা হয়েছে যে সিদ্ধ বিবাহ অসিদ্ধ বলে সাব্যস্ত হবে। যথা ঃ

(১) যদি স্বামী পুরুষত্বহীন হয়।

(২) যদি বিবাহের সময় কোন পক্ষ পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

(৩) যদি প্রতারণা দ্বারা বা বলপূর্বক অভিভাবক দ্বারা দরখাস্তকারীর সম্মতি নেওয়া হয়ে থাকে।

(৪) যদি বিবাহের পূর্বে স্ত্রী স্বামী ব্যতীত অপর কারোর দ্বারা গর্ভবতী হয়ে থাকে।

(৫) যদি অন্য স্ত্রী কি স্বামী বিদ্যমান থাকায় বিবাহ হয়ে থাকে।

(৬) যদি নিষিদ্ধ নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হয়ে থাকে।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত কারণগুলির মধ্যে যে কোন একটি কারণ দেখাতে পারলে আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদেরও আদেশ দিতে পারে—

(১) স্বামী বা স্ত্রী কেউ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

(২) ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে যদি আর হিন্দু না থাকে।

(৩) আদালতের কাছে বিবাহ ভঙ্গের জন্য দরখাস্ত করবার পূর্বে

ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর স্বামী কী স্ত্রী কেউ যদি বিকৃত মস্তিষ্ক হয়।

(৪) ওইরকম তিন বৎসরকাল যদি স্বামী কী স্ত্রী অনারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

(৫) ওইরকম তিন বৎসরকাল স্বামী কী স্ত্রী যদি কোন সংক্রামক যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

(৬) স্বামী কী স্ত্রীর কেউ যদি কোন ধর্মসম্প্রদায়ে যোগদান করে বা সংসার ত্যাগ করে।

(৭) স্বামী কী স্ত্রীর মধ্যে কেউ যদি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর নিরুদ্দিষ্ট থাকে।

(৮) যেখানে জুডিসিয়াল সেপারেশনের ডিক্রীর পর উভয়পক্ষ আর স্বামী-স্ত্রীরূপে সহবাস করে নি।

(৯) যদি রেষ্টিটিউশন অভ্ কনজুগাল রাইটস্-এর ডিক্রী হবার পর কোন একপক্ষ সেই ডিক্রী অমান্য করে অপর পক্ষ থেকে ক্রমান্বয়ে দু বৎসর পৃথক বসবাস করে থাকে।

এছাড়া আরও দু' কারণে স্ত্রী আদালতের কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। এ দুটি কারণের প্রথমটি হচ্ছে—যদি এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকতে স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে এবং আদালতে প্রার্থনা করবার সময় সে স্ত্রী জীবিত থাকে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—স্বামী যদি বলাৎকরণ, পুংমৈথুন বা কোনরূপ অস্বাভাবিক যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। ১৯৫৫ সালের এই আইন সম্পর্কে তিনটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম, বিবাহ সিদ্ধ হবার সময় থেকে তিন বছরের পূর্বে কোন পক্ষ আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন দরখাস্ত করতে পারবে না। দ্বিতীয়, আদালত কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেবার পর যদি তার বিপক্ষে কোন আপীল না করা হয়ে থাকে তাহলে এক বছর অপেক্ষা করে উভয়পক্ষই পুনরায় বিবাহ করতে পারে (যদি বিবাহ না করে

তাহলে আদালত খোরপোশ দেবার দাবী গ্রাহ্য করতে পারে) এবং তৃতীয়, আদালত কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ওই নির্দেশের পূর্বে স্ত্রী যে সন্তান গর্ভে ধারণ করছে সে সন্তান বৈধ বলে গণ্য হবে।

বলাবাহুল্য, এসকল আইন প্রণয়নের ফলে হিন্দুবিবাহ যে মাত্র গণতান্ত্রিকতা লাভ করেছে তা নয়, হিন্দুবিবাহ নূতন মর্যাদা পেয়েছে। বিবাহিতা হিন্দু নারী আজ সামাজিক বা পারিবারিক নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছে। আজ সে শিক্ষা পেয়েছে; আজ সে স্বাধীনতা পেয়েছে; আজ সে পুরুষের সঙ্গে সমান পদক্ষেপ ফেলে জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হবার সাহস ও সুযোগ পেয়েছে। আজ সে স্মৃতিকারদের নাগপাশ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেছে। আজ স্মৃতিকারদের স্থান গ্রহণ করেছে বিধান সভার সদস্যরা। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা স্মৃতিকারদের ভাষায় "অন্ত্যজ" জাতিভুক্ত। একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রভাবেই এই যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটেছে।